একক ৩ □ রবীন্দ্র উপন্যাস

গঠন

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ বউঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)

৩.৩ রাজর্ষি (১৮৮৭)

৩.৪ চোখের বালি (১৯০২)

৩.৫ নৌকাডুবি (১৯০৫)

৩.৬ গোরা (১৯১০)

৩.৭ চতুরঙ্গ (১৯১৬)

৩.৮ ঘরে বাইরে (১৯১৬)

৩.৯ যোগাযোগ (১৯২৯)

৩.১০ শেষের কবিতা (১৯২৯)

৩.১১ দুইবোন (১৯৩০)

৩.১২ মালঞ্চ (১৯৩৩)

৩.১৩ চার অধ্যায় (১৯৩৪)

৩.১৪ অনুশীলনী

৩.১৫ গ্রন্থপঞ্জি

৭.১ প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাসের সূচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমের স্থান ও মহিমা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকার নিয়েই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ভাবনার সূত্রপাত। সেই সময় ঐতিহাসিক ও সামাজিক—দুধরনের উপন্যাসরচনতেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান শীর্ষে। রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক সশ্রদ্ধ মন্তব্য করেছেন। উপন্যাস রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্রভেদী অবস্থান সম্বন্ধেও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং প্রথম দুটি উপন্যাস রচনাকালে হয়তো আপন অগোচরেই বঙ্কিমপ্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনার প্রয়াস হিসাবে করুণাকে মেনে নিলেও তাকে শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কোনো গুরুত্ব দিতে চাননি। তাই বৌঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩) ও রাজর্ষিকেই (১৮৮৭) তাঁর প্রথম পর্বের যুগল উপন্যাস বলে স্বীকার করতে হয়। ইতিহাস-আশ্রিত এই দুই উপন্যাসের মধ্যেই অলক্ষ্যে ছায়া ফেলে গেছে বঙ্কিমীপ্রভাব। ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে বিধৃত এই দুই উপন্যাসেই বঙ্কিমী ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ অনুসৃত হ'য়েছে, যদিও তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় ভাবনা ও ভঙ্গির চকিত কিরণ চোখে পড়ে। তারই অনিবার্য ফসল রাজর্ষির

ষোলো বছর পরে লোখা 'চোখের বালি' উপন্যাস যার মধ্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা গেল এবং বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে যা ঘটালো চিত্ত মুক্তি। এরপর থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব ধারায় উপন্যাস রচনায় ব্রতী হলেন, বঙ্কিমী প্রভাবের নির্মোক ভেদ করে স্বকীয় স্বরূপ ও মহিমায় প্রোজ্জ্বল হলেন ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ।

তাঁর তেরোটি (করুণা সহ) উপন্যাসের কালানুক্রমিক সূচি ঃ-

১। করুণা (১৮৭৭-৭৮)
২। বউঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)
৩। রাজর্ষি (১৮৮৭)
৪। চোখের বালি (১৯০২)
৫। নৌকাডুবি (১৯০৬)
৬। গোরা (১৯১০)
৭। চতুরঙ্গ (১৯১৬)
৮। ঘরে বাইরে (১৯১৬)
৯। যোগাযোগ (১৯২৯)
১০। শেষের কবিতা (১৯২৯)
১১। দুই বোন (১৯৩৩)
১২। মালঞ্চ (১৯৩৩)
১৩। চার অধ্যায় (১৯৩৪)

এই তালিকায় দৃষ্টি দিলে এটা স্পষ্ট হ'বে যে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে মাঝেমাঝেই সাময়িক বিরতি দিয়েছেন। অথচ কাব্য, কবিতা, গল্প বা প্রবন্ধ রচনায় একটি ধারাবাহিকতা ও নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বজায় ছিল।

রাজর্ষির ১৬ বছর পরে 'চোখের বালির' প্রকাশ। এই দীর্ঘ সময় সম্ভবত ছিল তাঁর মানস প্রস্তুতির কাল বঙ্কিমী ধারা থেকে উত্তীর্ণ হ'য়ে আপন পথে খুঁজে নিতে তিনি এই সময়টুকু নিয়েছিলেন। তাই রাজর্ষির পর 'চোখের বালি' এক নতুন ধারার সৃষ্টি—রবীন্দ্র সৃষ্টিতে এবং বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রেও। রোমান্স ধর্মী, ইতহাসাশ্রয়ী কাহিনীর ছত্রছায়া থেকে সমাজবাস্তবতার কঠিন পথে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পরিক্রমা শুরু হলো, বাংলাসাহিত্যও আধুনিক উপন্যাসের ধারার সঙ্গে পরিচিত হলো। উপন্যাসের চলার পথে আবারও সাময়িক বিরতি এসেছিল একই বছরে 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' রচনার পর। ১৯১৬-তে যুগল উপন্যাস প্রকাশ হবার পর দীর্ঘ বিরতির পর আবার ১৩ বছরের নীরবতার শেষে ১৯২৯-তে প্রকাশিত' হল 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা'। শেষ উপন্যাস 'চারঅধ্যায়' প্রকাশ পেলো ১৯৩৪-এ। এবং এখানেই থামলো রবীন্দ্রউপন্যাসের যাত্রা। আশ্চর্য এই যে ১৯৪১-এ মৃত্যুর অব্যবহিত আগে পর্যন্ত তাঁর কবিতা রচনার ধারা ছিল অব্যাহত। প্রবন্ধও রচিত হ'য়েছিল ১৯৪১-তে। দীর্ঘ গল্প হিসাবে তিনসঙ্গীর তিনটি বিখ্যাত গল্প শেষ বছরেই রচিত হ'য়েছিল, কিন্তু উপন্যস রচনার ক্ষেত্রে তিনি পূর্ণযতি টেনে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত রচনা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর ১৫ বছর বয়সে। শেষ প্রবন্ধ লিখেছেন আশি বছরেও। কবিতা তো তাঁর 'চিরকালের প্রেয়সী'—শৈশব থেকে অস্তমিত যৌবন বেলা পেরিয়ে প্রাহ্ন প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করে বার্ধক্যেও ছিল তাঁর নবীন কাব্য-সৃষ্টির আন্তর প্রেরণা, কিন্তু দীর্ঘ মাপের উপন্যাস রচনায় তিনি শেষপর্যন্ত কোনো আগ্রহ বোধ করেননি, যদিও বাংলা উপন্যাসকে আধুনিক যুগচেতনার সিঞ্চিত করে তিনিই প্রথম তাকে যুগোপযোগী মনস্তাত্বিক করায় সার্থক হ'য়েছিলেন।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রীতি প্রয়োগ করেছিলেন। তবে তাঁর প্রযুক্ত এই রীতি ছিল সরাসরি, কিংবা নাটকীয় রীতির সঙ্গে যুক্ত। কখনো বা অলৌকিকতার সাহায্যেও এগিয়েছেন, ফলে মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োগ অনেকাংশেই সরলীকৃত হ'য়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি ছিল অন্যতর। বিশিষ্ট সমালোচক ড. ক্ষেত্রগুপ্তের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যেতে পারে।

"রবীন্দ্রনাথ চোখের বালি থেকে প্রত্যক্ষ অ্যানলিটিক রীতির পূর্ণ সহায়তা গ্রহণ করেছেন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হ'ল ঘটনার সুর চড়াননি, বাইরে উত্তেজনাকে তীব্র করে তোলেন নি। প্রতিদিনের ছোটখাট ঘটনার একেবারে মামুলি প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে চিত্তলোকের বৃহৎ আলোড়ন ও পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।"

ফলে বঙ্কিমের উপন্যাস যেখানে অনেকটাই নাটকের মত চমকপ্রদ ও উত্তেজক—রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সেখানে অনুগ্র, অনাটকীয় এবং নাট্য আনুগত্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাধীন রীতির। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কালের মধ্যে বাংলার সামাজিক যে বিবর্তন ঘটেছিল, তা-ই তাঁদের রচনার রীতি ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের সময়ে—উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ নতুনভাবে গড়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কালে মধ্যবিত্ত সমাজের এই প্রতিষ্ঠা ছিল না। এই প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত সমাজ রবীন্দ্রনাথের মনোদর্পণে যথার্থ প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক মধ্যযুগীয় সমারোহের অবসান ঘটলো এবং প্রাত্যহিক জীবনের সমাজ বাস্তবতা উপন্যাসে নিজস্ব জায়গা খুঁজে পেলো। ফলে বঙ্কিমযুগের রোমান্স অনেকটাই স্তিমিত হ'য়ে শেষ পর্যন্ত অন্তর্হিত হ'ল। রবীন্দ্র মানস রোম্যান্টিক হ'য়েও একান্তভাবেই অন্তর্মুখী, ফলে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তাঁর উপন্যাসে তীব্র গভীর হ'য়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের স্বাভাবিক জীবন প্রবাহ বাস্তব ও বিশ্বাস্য হ'য়ে দেখা দিয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজজীবনের প্রাত্যহিক জীবনের দ্বন্দ্ব সমস্যা, বিরোধ-মিলন, কর্মপ্রবাহ একান্ত বাস্তবনিষ্ঠভাবে রবীন্দ্র উপন্যাসে উপস্থাপিত। রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ উপন্যাসেই তৎকালীন পরিবার জীবনের ছবি আছে। আবার সমসাময়িক রাজনৈতিক চেতনা ও আন্দোলনও সেখানে অনিবার্য ছায়া ফেলে গেছে। তিনি নিজে বিভিন্ন সময়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দেশের রাজনীতি প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন এবং তার প্রকাশ তাঁর উপন্যাসগুলিতে অনেক সময়ই দেখা গেছে। তবে তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা প্রায়ই প্রথাসিদ্ধ পথে না গিয়ে নিজস্ব এক রূপ নিয়েছে। এরই ফলস্বরূপ 'বউঠাকুরানীর হাট' বা 'রাজর্ষি'র মত প্রথম যুগের উপন্যাস ছাড়াও পরবর্তী 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' বা 'চারঅধ্যায়ে' তাঁর নিজস্ব প্রত্যয়দীপ্ত জাতীয়তাবোধ, স্বাদেশিকতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও নাটকের মতে তাঁর উপন্যাসকেও অনেকে তত্ত্বের বাহক বলতে চান। একথা সত্য যে তাঁর কোনো কোনো উপন্যাসে তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটেছে, হয়তো কিছুটা সচেতনভাবেই, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তাঁর উপন্যাসে জীবনের রহস্যজটিল গভীরতা ও বাস্তবদৃষ্টির পরিচয়ই প্রকাশিত। বাংলা উপন্যাসে যথার্থ আধুনিকতা, রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই প্রথম এলো। শরৎচন্দ্রের উক্তিতে এর পরিচয় মিলবে।

> "তারপরে এলো বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়ের যুগ। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো। সেদিনের সে গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনোদিন ভুলবো না। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়—নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম।"

করুণা ঃ (১৮৭৭-৭৮) রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'করুণা'। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে রচিত ছোট আকারের এই উপন্যসটিকে রবীন্দ্রনাথ নিজে পূর্ণ মর্যাদা দিতে চাননি বলেই এটি রচনাবলীতে গ্রন্থিত হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের

লেখা প্রথম উপন্যাস বলেই সাহিত্যের ইতিহাসে এর আলোচনা হয়ে থাকে—না হলে এর কোনো মূল্য নেই। কাহিনীর সূত্রে অবশ্য ক্ষীণভাবে 'চোখের বালি'-র কথা মনে আসে। একারণে অনেকে বলেন 'করুণা'-র মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল 'চোখের বালি'-র বীজ যা পঁচিশ বছর পরে পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ উপন্যাসের অন্যতম নায়ক মহেন্দ্র দাম্পত্য সম্পর্ক বহির্ভূত প্রেমবাসনার জটিলতায় আকৃষ্ট হয়েছে বিধবা মোহিনীর প্রতি—কাহিনীর এই অংশটুকু 'চোখের বালি'র মহেন্দ্র-বিনোদিনীর কথা মনে পড়ায়। কিন্তু 'চোখের বালির' পরিণতমনস্ক ভাবনা ও মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণ কিছুই এই অপরিণত রচনায় প্রকাশ পায়নি। বরং 'করুণা'র কাহিনী ও চরিত্র বয়নে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৩.২ বউঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)

'বউঠাকুরাণীর হাট'-কেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম উপন্যাসের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেকালের বারভুঁইয়াদের অন্যতম যশোরের প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে এই কাহিনীর বিস্তার। স্বভাবতই একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এখানে আছে। ১৮৬৯-তে প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিকেই 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের উৎস বলে মনে হয়। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার যে ধারা প্রবহমান ছিল, রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসে সেই ধারারই সংযোজন। তবে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশে স্বাধীনতা স্থাপনে আগ্রহী প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতা সংগ্রামী সত্তার চেয়ে প্রজাপীড়ক নিষ্ঠুর রূপে পরিচয়ই তাঁর রচনায় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে—

> "আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম
> তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে
> উপেক্ষা করবার মত অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল, কিন্তু ক্ষমতা ছিল না"

ইতিহাসের এই তথ্যকে গুরত্ব দিয়েছিলেন বলেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যের প্রচলিত দেশাভিমানী সত্তাকে উজ্জ্বল করে দেখাননি।

এ উপন্যাসে প্রতাপাদিত্য কর্তৃক দিল্লীর বাদশাহের বিরোধিতা, পিতৃব্য বসন্ত রায়কে হত্যা, জামাই রামচন্দ্রকে হত্যার পরিকল্পনা ইতিহাস-সমর্থিত ঘটনা। অন্যদিকে বউঠাকুরানী বিভা, উদয়াদিত্য, সুরমা ইত্যাদি চরিত্র ও কাহিনী লেখকের কল্পনাসঞ্জাত। সর্বোপরি প্রতাপাদিত্য ও উদয়াদিত্যের বিরোধের মধ্যে প্রতাপ ও প্রেমের দ্বন্দ্ব ও তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। উপন্যাসে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের মধ্যে সংসার সীমায় আবদ্ধ এক পারিবারিক কাহিনী চিত্রণই ঘটেছে। সাধারণ বাঙালি জীবনের অন্দরমহলের রূপটি এখানে প্রকট। শাশুড়ীর বধূ নির্যাতন থেকে ভাইবোনে প্রীতি, ননদ-বৌদিতে মধুর সম্পর্ক, দাসীদের ষড়যন্ত্র সবই পরিচিত ছকের ছবি। সেইসঙ্গে উদয়-বিভার দাদামশাই বসন্ত রায়ের স্নেহ-মধুর রসিক ভূমিকাটিও উপভোগ্য। পাশাপাশি প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে পুত্র উদয়াদিত্য ও জামাই রামচন্দ্রের বিরোধ ঘনিয়ে তুলেছে পারিবারিক ও সামাজিক বিরোধ। শ্বশুর-জামাইয়ের বিরোধের মধ্যে দুই জমিদার বংশের মর্যাদার লড়াই পারিবারিক সীমা ছাড়িয়ে সামাজিক স্তরে পৌঁছে যায়। অন্যদিকে প্রতাপাদিত্যর দিল্লীর বাদশাহের প্রতি আক্রোশ ও বিদ্রোহ রাষ্ট্রিক আন্দোলনের চেহারা নেয়। ফলে সাধারণ পারিবারিক গণ্ডী ছাড়িয়ে উপন্যাসটি ইতিহাসের আশ্রয়ে বিস্তৃতি লাভ করে। তবে আন্তরধর্মে রচনাটিকে সামাজিক পারিবারিক উপন্যাস বলাই সঙ্গত।

বাঙ্গালি পারিবারিক ছবিটি এখানে পুরোপুরি উপস্থিত। শাশুড়ির পুত্রবধূর প্রতি ঈর্ষা, পুত্রবধূর পিত্রালয়ের প্রতি অবজ্ঞা থেকে শ্বশুর প্রতাপাদিত্যের পুত্রবধু সুরমার উপর ক্রোধ বাঙালি পরিবারের পরিচিত চিত্র। বাড়িতে দীর্ঘদিন পর জামাই আসার আনন্দ উৎসবের ছবিটিও স্বাভাবিক।

পাশাপাশি বঙ্কিমী রোম্যানস রচনার সূত্রে কাহিনীতে এসেছে রুক্মিনী-মঙ্গলার প্রসঙ্গ, যেটি পাঠককে মনে পড়ায় বিষবৃক্ষর হীরা-কাহিনী। প্রেমে প্রত্যাখ্যাতা হীরা কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু কামনা করেছিল, এখানে উদয়াদিত্যের কাছে প্রত্যাখ্যাত প্রতিহিংসাপরায়ণা রুক্মিনী সুরমার মৃত্যু ঘটিয়েছে। উদয়-রুক্মিনীর প্রথম যৌবনের ক্ষণিক সম্পর্ক উপন্যাসে আভাসিত, কিন্তু তারই জন্য সুরমাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। প্রথম যৌবনের কামনাদগ্ধ অপরাধে অনুতপ্ত উদয়াদিত্যের কাছে সুরমার মৃত্যু প্রবল আঘাত। কিন্তু উদয়াদিত্য চরিত্র হিসাবে অনেকটাই নিষ্প্রাণ। তাই স্ত্রীর প্রতি প্রেমে নিষ্ঠ অবিচল থেকেও সে নিজের মার বধু নির্যাতনের কোনো তীব্র প্রতিবাদ করেনি। লেখক অবশ্য তার চরিত্রে অন্যভাবে সক্রিয়তা দেখিয়েছেন। বিভার স্বামী রামচন্দ্র এবং দাদামশাই বসন্ত রায়কে পিতার ক্রোধের কোপ থেকে বাঁচাতে সে চেষ্টা করেছে। দরিদ্র প্রজাদের হিতসাধন কার্যে পিতার বিরাগ ভাজন হয়েছে। শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাকে তাঁর মুক্তিতত্ত্বের বাহন করে নির্লিপ্ত রাজ্যত্যাগী করে দেখিয়েছেন। প্রতাপাদিত্যের উগ্র ভোগবিলাসী নিষ্ঠুর বিবেকহীন প্রজাপীড়ক চরিত্রের পাশে পুত্র উদয়ের বীর প্রশান্ত চরিত্র যেন বৈপরীত্য সৃষ্টির জন্যই রচিত। রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রিয় প্রেম-প্রতাপের দ্বন্দ্ব হিসাবে পিতাপুত্রের এই বিরোধকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

বসন্ত রায় চরিত্রটি রবীন্দ্রভাবনার বাণীমূর্তি। তার মধ্যে কবিত্ব, সঙ্গীত ও সহজ সারল্য রবীন্দ্রনাথেরই পরিকল্পিত 'ঠাকুরদা' চরিত্রকে মনে করায়।

প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিভার নামেই 'বউঠাকুরাণীর হাট' নামাঙ্কিত। কিন্তু উপন্যাসে প্রধান নারী চরিত্র হিসেবে প্রত্যাশিত গুরুত্ব তার চরিত্রে নেই। সব মিলিয়ে কোমল স্বপ্নমধুর এক চরিত্র যা শেষ পর্যন্ত স্বামী প্রেমবঞ্চিত বেদনায় এক ত্যাগব্রতী মহিমা লাভ করেছে।

উপন্যাসটিতে অবশ্য রোম্যান্সধর্মিতার জন্যই মাঝে মাঝেই নাট্যরস প্রযুক্ত। বিষপ্রয়োগ, কারাদণ্ড, প্রাণনাশ গুপ্তহত্যা, অগ্নিসংযোগ—ঘটনার ঘনঘটা পারিবারিক পরিমণ্ডলে রোম্যান্স রস সৃষ্টি করেছে।

৩.৩ রাজর্ষি (১৮৮৭)

এটিও ইতিহাসশ্রিত উপন্যাস এবং বঙ্কিমী পরিমণ্ডলের ছত্রছায়ায় লিখিত, যদিও এর মধ্য থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় রীতির আভাস মেলে। এ উপন্যাসেও তাঁর বিশিষ্ট তত্ত্বভাবনা রূপায়িত, তাকে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপিত করা হয়েছে। তিনি নিজেই এই গ্রন্থ রচনায় কৈলাসচন্দ্র সিংহ রচিত 'ত্রিপুরার ইতিহাস' এবং 'স্টুয়ার্ট কৃত বাংলার ইতিহাস' থেকে উপাদান সংগ্রহের কথা বলেছেন। উপন্যাসে ত্রিপুরার রাজপরিবার, মোগল সৈন্যের আক্রমণ, শাহসুজার উপপ্রসঙ্গ ইতিহাসের অনুমোদনপুষ্ট সন্দেহ নেই কিন্তু আসলে, 'রাজর্ষি' রবীন্দ্রনাথের প্রেমপ্রীতিপূর্ণ মঙ্গল ভাবনারই আদশায়িত প্রকাশ। গোবিন্দমাণিক্য চরিত্রের মধ্য দিয় আপন আদর্শবাদকেই প্রতিষ্ঠিত করত চেয়েছেন।

ধর্মসম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট প্রত্যয় গোবিন্দমাণিক্যের মধ্য দিয়ে আভাসিত। ইতিহাসে ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দমাণিক্য ধর্মপ্রাণ হিন্দুনৃপতি বলে খ্যাত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে এই চরিত্রে মানবিক প্রেমধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। দেবী মন্দিরে জীব বলিদান প্রথা বন্ধ করার জন্য রাজার ঘোষণার মধ্য দিয়ে অহিংস ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রমননে বৌদ্ধধর্মের প্রেম মৈত্রী অহিংসার প্রতি যে সশ্রদ্ধ অনুরক্তি ছিল, তার প্রকাশ তাঁর নানা রচনায় প্রতিবিম্বিত। রাজর্ষি-তেও তার ছায়াপাত ঘটেছে। এই ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস আবর্তিত হয়েছে ধর্মাদর্শের বিরোধকে কেন্দ্র করে। রাজা গোবিন্দমাণিক্য ও রাজ পুরোহিত রঘুপতির ধর্মাদর্শের সংঘাতই এই মূল বিষয়। এটি আরো সংহত রূপে প্রকাশ পেয়েছে বঙ্গাব্দ ১২৯৬-এ রচিত 'বিসর্জন' নাটকে। রাজর্ষি উপন্যাসে ধর্মাদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা। মুঘল বাদশাজাদা সুজার কাহিনী পুষ্ট করেছে এর ইতিহাস অংশকে, সুজার প্রসঙ্গে ইতিহাসের হাত ধরে কিছু রোম্যান্সধর্মী কল্পনাও এসেছে, তবে ইতিহাসের আনুগত্যও স্বীকার করতে হয়।

বিদেশী সৈন্যের আক্রমণে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্যত্যাগ করে নির্বসনে যাত্রার অংশও ইতিহাস সমর্থিত। তবে সেখানে তাঁর ভীরুতাকেই দেখানো হয়েছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে নিরাসক্তি ও আদর্শবাদ বলে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রমননে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ অনুরাগের কথা সবিদিত। সেই আদর্শ বারবার তাঁর বিভিন্ন রচনায় বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। গোবিন্দমাণিক্য চরিত্র রচনায় সেই শান্ত, সমাহিত, অহিংস, স্থিতপ্রজ্ঞ, সর্বত্যাগী আদর্শকে তিনি ব্যবহার করেছেন। সেই প্রাচীন ভারতের তপোবন আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তাঁর গোবিন্দমাণিক্য রাজা থেকে 'রাজর্ষি' হয়ে উঠেছেন। রাজারর শক্তিসত্তা ও অধিকারবোধের চেয়ে তাঁর হাসি-তাতা-কেন্দ্রিক বাৎসল্য, নক্ষত্রের প্রতি ভ্রাতৃপ্রেম ও রাজ্যত্যাগের মহিমাই উপন্যাসে লেখক প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শেষপর্যন্ত তাঁর পাঠশালা স্থাপন ও পরিবর্তিত হৃদয় রঘুপতির সেই কার্যে যোগদানের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মহতী ভাবাদর্শকে জয়ী করেছেন। প্রতাপের চেয়ে প্রেমের শক্তি বেশি—এই মানবিক বোধ উপন্যাসটিতে সঞ্চারিত।

প্রতিনায়ক রঘুপতি লেখকের সৃষ্টিকুলশলতার নিদর্শন। এই চরিত্রটিকে বৃত্তাকার চরিত্র বলা যায়, যার মধ্যে স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব ও বিবর্তন আছে। গোবিন্দমাণিক্য আদর্শে অবিচল ধ্রুব চরিত্র। রঘুপতি কিন্তু প্রতিবাদে, প্রতিরোধে, উগ্র ধর্মান্ধতায়, প্রতিহিংসায় ক্ষতবিক্ষত এক চরিত্র। রাজার প্রতি তার বিরূপ ক্রোধোন্মত্ততার পাশাপাশি পালিত পুত্র জয়সিংহের প্রতি আন্তরিক স্নেহ তার চরিত্রে এক আলাদা মাত্রা এনেছে। সেইসঙ্গে দেবীমন্দিরে ধর্মাচরণে তার অদিকারবোধ ও ক্ষমতা রক্ষার ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে উগ্র ধর্মান্ধতা। পুরোহিত তন্ত্র ও রাজতন্ত্রের মধ্যকার সংঘাত অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য নিপুণতার চিত্রিত হয়েছে।

গোবিন্দমাণিক্যর সৎ বিবেকী মানবতাবাদী আদর্শায়িত চরিত্রের বিপরীতে রঘুপতির উগ্র ধর্মান্ধ ষড়যন্ত্রপ্রবণ চরিত্র উপস্থাপিত। এমনকি পুরোহিত ধর্মাশ্রয়ী রঘুপতির ধর্মবিশ্বাসও সেই অর্থে হৃদয়ের বস্তু নয়। তাই অধিকার রক্ষার জন্য সে মিথ্যাচারণ করেছে, রাজা ও ধ্রুবকে হত্যার ব্যর্থ পরিকল্পনা করেছে, স্বভাবদুর্বল রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে রাজ্যলোভ দেখিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করেছে। এর কোনোটিই রাজপুরোহিতের আদর্শ ধর্মবোধের পরিচয়বাহী নয়। তার চরিত্রের সদর্থক দিক—জয়সিংহের প্রতি তার আন্তরিক স্নেহ বাৎসল্য। তবু, জয়সিংহের আত্মদানেও তার চরিত্রে পরিবর্তন আসেনি—এসেছে অনেক পরে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে জয়সিংহের মৃত্যুতে যে ট্র্যাজিক রূপান্তর রঘুপতি চরিত্রে প্রত্যাশিত ছিল—তা এসেছে চল্লিশ অধ্যায়ে। সম্ভবত পত্রিকার চাহিদানুযায়ী এই দীর্ঘ বিস্তার সম্ভব হয়েছে। কারণ একই বিষয়াশ্রয়ী 'বিসর্জন' নাটকে জয়সিংহের মৃত্যুতেই নাটক শেষ হয়েছে এবং রঘুপতি চরিত্রে এসেছে বৈপ্লবিক রূপান্তর ও ট্যাজিক পরিণতি। এই উপন্যাসে কিছুটা চেষ্টাকৃত ভাবে রঘুপতির গোবিন্দমাণিক্যের কাছে মঙ্গলবোধে আশ্রয় নেবার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

জয়সিংহ একটি সুপরিকল্পিত চরিত্র। নাটক 'বিসর্জন'-এ তার ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, তবু 'রাজর্ষি' উপন্যাসেও তার ট্র্যাজিক পরিণতি বেদনাদায়ক। পিতৃসম রঘুপতির প্রতি তার আনুগত্য ও শ্রদ্ধা কিন্তু রাজা গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা-ভক্তিকে টলাতে পারেনি। গোবিন্দমাণিক্য তার জীবনে ধ্রুব আদর্শ। তাই রাজহত্যার চক্রান্ত তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছে। তার অন্তরের সংকটে দ্বিধাজর্জর জয়সিংহ আত্মহনন ছাড়া অন্য কোনো পথ খুঁজে পায়নি। 'বিসর্জন' নাটকে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে নাটকীয় উৎকর্ষ লাভ করেছে। কিন্তু 'রাজর্ষি' উপন্যাসে এই চরিত্রের আত্মিক অবক্ষয়ের দ্বন্দ্বজটিল মানসিকতা সম্পূর্ণ প্রকাশিত নয়। তবে এই চরিত্রকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক ভাবনা আত্মপ্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রমনোধর্মে এই সহজ প্রাণের সৌন্দর্য, আবেগ ও কোমলবৃত্তির প্রতি আকর্ষণ চিরন্তন। তাই সমালোচক ড. নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন—

> "রঘুপতি, নক্ষত্র রায় অপেক্ষা গোবিন্দমাণিক্য ও কোমলহৃদয় হাসি ও তাতার, জয়সিংহের দ্বিধাগ্রস্ত জীবনের সৌন্দর্যের প্রতই কবির পক্ষপাত। এই স্বচ্ছ কোমল সুকুমার মুক্ত উদার জীবনপ্রবাহই রবীন্দ্র কবিচিত্তকে দোলা দিয়াছে"

নক্ষত্র চরিত্রসৃষ্টি হিসেবে সফল। ব্যক্তিত্বহীন দুর্বল স্বভাবের নক্ষত্র জ্যেষ্ঠভ্রাতা গোবিন্দমাণিক্য ও রাজপুরোহিত রঘুপতির ধর্মাদর্শের দ্বন্দ্বসঙ্কুল আবর্তে সংকটাপন্ন। দুই ব্যক্তিত্বের প্রাবল্যে তার ভীরুতা অধিকতর প্রকটিত। রাজা হবার লোভে সে রঘুপতির চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছে আবার দাদা গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি তার অন্তর্লীন শ্রদ্ধাবশত মন থেকে তাকে পুরোপুরি মানতে পারেনি। কিন্তু সে মানুষ হিসেবে অতি বাস্তব ও সাধারণ। তাই রাজা হবার পর তার চরিত্রে এলো পরিবর্তন এমনকি রঘুপতির কর্তৃত্বকেও সে অস্বীকার করলো।

বিল্বন চরিত্রটিও আদর্শবাদের প্রতীক। তবে রবীন্দ্রনাথ তাকে সক্রিয় দেখিয়েছেন, তাই সে রাজাকে বলেছে প্রয়োজনে বিদ্রোহী নক্ষত্রকে বধ করতে। বিপন্ন রাজ্য বাঁচাতে সে সৈন্য সংগ্রহ করেছে। তার চরিত্রে সেবাধর্ম মানবিকবোধে উজ্জ্বল, কিন্তু সে গোবিন্দমাণিক্যের মত প্রতীকিত আদর্শবাদ নয়—তার চরিত্রে প্রতিবাদ আছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণের শক্তিও আছে। হাসি ও তাতা—দুটি শিশুচরিত্র উপন্যাসে উল্লেখ্য ভূমিকা নিয়েছে। যে অহিংস আদর্শবাদ ছিল ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য তাকে স্বপ্নে দেখা কাহিনীর আদলে বিন্যস্ত করে রবীন্দ্রনাথ হাসি ও তাতাকে উপস্থাপিত করেছেন।

> "স্বপ্নে দেখলুম—একটা পাথরের মন্দির। ছোট মেয়েকে নিয়ে বাপ এসেছেন পুজো দিতে। সাদা পাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে বলির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দেখে মেয়েটির মুখে কী ভয়। কী বেদনা। বাপকে সে বারবার করুণ স্বরে বলতে লাগল, বাবা এত রক্ত কেন!"

এই স্বপ্নকে কাজে লাগালেন রবীন্দ্রনাথ—ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে রঘুপতির বিরোধের অদৃশ্য হাতিয়ার হয়ে উঠে এলো বলিদান প্রথা বন্ধের আদেশ। স্বপ্নে দেখা বালিকা হাসি ও তার ভাই তাতা—উপন্যাসে দেখা দিল রাজার স্নেহবাৎসল্য ও আদর্শের প্রতীক রূপে।

উপন্যাসটি আয়তনে বিশাল। মোট চুয়াল্লিশটি অধ্যায় ও উপসংহারে বিন্যস্ত কাহিনী অকারণেই দীর্ঘায়িত। 'বিসর্জন' রচনার সময় এই বহুশাখায়িত ব্যাপ্তি কমিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে সংহত রূপে প্রকাশ করেছেন। তবে নাটক মূলত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার স্ফুরণ, কিন্তু উপন্যাসে একটি ক্রমাভিব্যক্ত ধারাবাহিকতা থাকে। ফলে 'রাজর্ষি' সেই দৈর্ঘ লাভ করেছে এবং ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করায় কাহিনী এক বিশাল ব্যাপ্তি লাভ করেছে। তবে ইতিহাস নয় আদর্শবাদে প্রতিষ্ঠাই এই উপন্যাসের লক্ষ্য।

৩.৪ চোখের বালি (১৯০২)

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে 'চোখের বালি' এক স্মরণীয় ও বিশিষ্ট নাম। রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করে এই আধুনিক উপন্যাসের প্রকৃতি নির্ধারণ সহজ হবে।

> "সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধইত হচ্ছে ঘটনা-পরম্পরায় বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তার আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।"

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ এই উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যে আধুনিকতার পথ উন্মুক্ত করে দিল। নর-নারীর প্রেম-অপ্রেম, বাসনা-বিভ্রম, চিত্তের দহন ও দীপ্তির যে জটিল দুরধিগম্য রূপায়ণ চোখের বালিতে ঘটেছে, তা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে এযাবৎ অপরিচিত ও অভাবনীয় ছিল। নৈতিকতার প্রশ্নে উত্তাল নিষিদ্ধ প্রেমের এই বিষয়কে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত আধুনিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে বাস্তব করে তুলেছেন। চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিত্বের আরোপও এমনভাবে প্রথম দেখা গেল।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ ছিল। 'চন্দ্রশেখরের' শৈবলিনী ও 'রজনীর' লবঙ্গলতার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মনোরহস্য নিঃসন্দেহে বঙ্কিম দেখিয়েছিলেন। 'বিষবৃক্ষের হীরা' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলের'

রোহিনী ও ভ্রমর—সকলেই জীবনানুরাগ ও বিষামৃত জ্বালার শিকার। তবু বিনোদিনী এদের সকলকে অতিক্রম করে গেছে, সে আদ্যন্ত আধুনিক নারী। একবিংশ শতকেও এই নারী বাংলা উপন্যাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রহস্যজটিল প্রেমানুভবের নিদর্শন হিসাবে স্বীকৃত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যই এ উপন্যাসের অন্দরমহলকে স্পষ্ট আলোকিত করতে সাহায্য করে। তিনি বলেছেন চোখের বালিতে তিনি প্রবেশ করেছেন—

> "মনের সংসারের সেই কারখানা ঘরে, যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে।....যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে"

মানবপ্রবৃত্তির বিচিত্র লীলা চোখের বালিতেই প্রথম এমন আবরণহীন বাস্তবতায় দেখা দিল। বঙ্কিমী রোম্যান্সের আড়াল ঘুচিয়ে রবীন্দ্রনাথের নর-নারী প্রত্যক্ষ বাস্তবমূর্তিকে উপস্থিত হল।

বাংলা উপন্যাসের ঘটনা নির্ভর কাঠামোর পরিবর্তে চরিত্র নির্ভর কাহিনী রচনার সূত্রপাত ঘটলো এই উপন্যাসে। শুধু তাই নয় চরিত্রের রহস্য জটিল অন্তর্লোক উদঘাটিত হল নিপুণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে। 'মানববিধাতার নির্মম সৃষ্টি প্রক্রিয়া'র নগ্নরূপ সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হল। প্রকৃত অর্থেই বাংলা উপন্যাস হয়ে উঠলো আধুনিক ও প্রাপ্তবয়স্ক।

এর প্রধান চরিত্র নায়িকা বিনোদিনী। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সমস্যার কেন্দ্রে ছিল পুরুষ চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ নারীকে আনলেন সমস্যার কেন্দ্রে। ফলে 'চোখের বালিতে' মহেন্দ্রর চেয়ে প্রধান হ'য়ে উঠলো বিনোদিনী। এবং নারীর সমস্যা বলেই তা হল জটিলতর। বিধবা নারীর মনোজগতের চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে হলো বিনোদীনী চরিত্রে, বঙ্কিম 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ যথাক্রমে কুন্দনন্দিনী ও রোহিনীকে এনেছিলেন—বিধবার হৃদয়গত জটিল সমস্যা সেখানেও ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী চরিত্রদীপ্তিতে আলাদা জাতের। তাঁর আত্ম আবিষ্কার আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসার ফলশ্রুতি। নরনারীর হৃদয়ঘটিত সমস্যা এখানে শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে এবং চতুষ্কোণ প্রেম জটিলতা কাহিনীতে এনেছে অন্যমাত্রা। মহেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রণয় ও মোহপাশের পাশাপাশি এসেছে আশা ও বিহারী চরিত্র। চারটি চরিত্রের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিচিত্র লীলা, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, প্রেম, ঘৃণা, শ্রদ্ধা, ঈর্ষা আশ্চর্য দক্ষতায় রূপায়িত হয়েছে।

বিবাহিত মহেন্দ্রর সুখী দাম্পত্য জীবনে অশান্তির বীজাকারে প্রকাশ ঘটে মহেন্দ্রর মা রাজলক্ষীর ঈর্ষায়। সেই বীজ ধীরে ধীরে মহীরুহ-তে পরিণত হয় সংসারে বিধবা বিনোদিনীর আগমনে। বহ্নিময়ী বিনোদিনীর কামনাবহ্নিতে আকৃষ্ট পতঙ্গ মহেন্দ্রর সংরাগ রক্তিম বিহ্বলতায় সুখের সংসার হয়ে ওঠে উত্তাল অশান্ত। পুত্রবধু আশার প্রতি বিরূপ জননী রাজলক্ষী সেই অনলে ইন্ধন জোগায়। স্বয়ং ঔপন্যাসিকের মন্তব্য আমাদের ধারণাকেই অনুমোদন করে।

"'চোখের বালি'র গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা" কামনা ও ঈর্ষার অনলে জ্বলে ওঠা সংসারের ছবিটি পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিধবা বিনোদিনী তার প্রতিকূল ভাগ্যের বঞ্চনাকে যেন চ্যালেঞ্জ জানাতেই নিরপরাধ আশাকে প্রতিপক্ষ খাড়া করে মহেন্দ্র বিজয়ের খেলাতে মত্ত হয়। আশা তার সখী—তার 'চোখের বালি'। দুই সখীর এই পাতানো নামকে রবীন্দ্রনাথ অসামান্য দক্ষতায় কাহিনীর নামকরণে ব্যবহার করেছেন। শেষপর্যন্ত দেখা যায় প্রধান চারটি চরিত্রই হয়ে উঠেছে একে অপরের চোখের বালি।

মহেন্দ্রর বন্ধু বিহারী এ কাহিনীর বিশিষ্ট চরিত্র যাকে ঘিরে উপন্যাসের চতুর্ভুজ সম্পূর্ণ হয়েছে। মহেন্দ্রর অসংযমী, অস্থিরচিত্ততার পাশাপাশি বিহারী শান্ত-সমাহিত আদর্শায়িত চরিত্র। তার মধ্য দিয়ে লেখক তাঁর তত্ত্বাদর্শকে প্রকাশ করেছেন। আশার সঙ্গে বিহারীর বিবাহ স্থির হবার পর মহেন্দ্রর জেদের প্রাবল্যে তা ভেঙে যায়—স্বয়ং মহেন্দ্র আশাকে বিয়ে করে। দুই বন্ধুর অন্তর্বিরোধ সম্ভবত তখনই শুরু হয়েছিল, তবে লেখক কখনো সে বিষয়ে সোচ্চার হননি। মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য জীবনে এ ঘটনা কোনো সমস্যাও সৃষ্টি করেনি। যদিও বিহারীর অন্তরে আশা সম্বন্ধে এক কোমল অনুভূতি ছিল অন্তর্লীন, সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যা প্রকাশ পেয়েছে। বিহারী

চরিত্রের সদর্থক ভূমিকা উপন্যাসে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছে। বিনোদিনীকে নিয়ে মহেন্দ্রর দাম্পত্য জটিলতাকেও বিহারী সরল করতে চেষ্টা করেছে। প্রথমে সে বিনোদিনীর প্রতি বিরূপ ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে সে নিজেই বিনোদিনীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে। এই আকর্ষণের প্রকৃতি মহেন্দ্রর কামনা থেকে অন্যতর। বিনোদিনী শেষপর্যন্ত বিহারীর মধ্যেই খুঁজে পায় প্রকৃত প্রেমকে। আসলে মহেন্দ্র ছিল তার আতপ্ত প্রেমের বহিরঙ্গ কামনা। কিন্তু বিহারী তার অন্তরঙ্গ প্রেমানুভবের প্রেরণা। কামনার অগ্নিতে দগ্ধ বিনোদিনী বিহারীর প্রেমে পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। বিহারী আপন অন্তরের সত্য উপলব্ধি করেও বিনোদিনীকে প্রত্যাখ্যান করে। তার প্রত্যাখানে বিনোদিনীর প্রেম আরো পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনী চরিত্র পরিক্রমায় কামনা থেকে প্রেমে উত্তরণ দেখিয়েছেন। মহেন্দ্রকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করার পিছনে ছিল তার প্রতিহিংসার মনোভাব। মহেন্দ্র যে তাকে প্রত্যাখ্যান করে আশাকে বিয়ে করেছিল, সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই তার এই ধ্বংসলীলা। আশার প্রতি তীব্র ঈর্ষায় সে তার সংসারকে দগ্ধ করতে চেয়েছে এবং মহেন্দ্রকে অতি সহজেই তার কামনা-রক্তিম প্রবৃত্তির দাস করতে পেরেছে। মহেন্দ্র আশার নষ্টনীড়ের ছবি দেখে আশ্বস্ত, তৃপ্ত বিনোদিনী এবার তাকিয়ে দেখলো নিজের অন্তরে—সেখানে বিহারী অধিষ্ঠিত পূজামূর্তিতে। রবীন্দ্রনাথ কামনা তাড়িত বিনোদিনকে উত্তীর্ণ করলেন প্রেমের তপস্যায়। তাই বিহারীর বিবাহ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে পূর্ণ অন্তরে সে ছেড়ে গেল বিহারীকে। বিহারীকে চাওয়া তার কাছে যতখানি সত্য ছিল, তাকে ছেড়ে যাওয়াও ততখানি সত্য হয়ে তার অন্তরকে উদ্ভাসিত করলো।

বিনোদিনীর ভাষায় 'ননীর পুতুল' আশা লেখকের মমতা দিয়ে সৃষ্টি। উপন্যাসের শুরুতে যে সরল অনভিজ্ঞ কিশোরী বধূকে দেখি, কাহিনীর পরিণতিতে সে দুঃখ দহনের তাপে ও সংসারের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণা এক নারী রূপে বিকশিত। তার সারল্যের সুযোগে বিনোদিনী সুকৌশলে তার স্বামীকে মোহমুগ্ধ করেছে, সংসারে তীব্র অশান্তি ঘনিয়ে তুলেছে। তার শাশুড়ীও তার দাম্পত্যসুখে মনস্তাত্ত্বিক ঈর্ষা ভোগ করে তারই ওপর নিষ্ঠুর হয়েছেন এবং একদা পত্নী প্রেমে উন্মত্ত তার স্বামী মহেন্দ্র শেষপর্যন্ত তাকে ত্যাগ করে বিনোদিনীকে নিয়ে উন্মত্ত হয়েছে। তার মাসি অন্নপূর্ণা ও বিহারীর কাছে সে সান্ত্বনা ও সমবেদনা লাভ করেছে। স্বামীর অনাদর ও প্রেমের লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে এই বালিকা বধূ কখন যে ধীরে ধীরে পরিণতমনস্কতায় পৌঁছে গেছে তার বিশ্লেষণ লেখক করেননি। কিন্তু উপন্যাসের শেষে অবিচলিত ধৈর্য ও সংযমের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের মিশ্রণে সে যেন নতুন মানুষ হয়ে উঠেছে। বিহারী এবং মহেন্দ্রও তার এই পরিণত মানসিকতা লক্ষ্য করে বিস্ময়াভিভূত হয়েছে।

উপন্যাসের শেষে বিনোদিনীর কাশী গমন এবং মহেন্দ্র আশার পুনর্মিলন সূচিত হয়েছে। আপাত মিলনান্ত এই কাহিনীর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ট্র্যাজিক সুর পাঠকের মনে থেকে যায়।

'নষ্টনীড়' গল্পকে রবীন্দ্রনাথ নির্মম সাহিত্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন। 'চোখের বালি'ও সেই পর্যায়েই পড়ে। লেখক বর্ণিত 'মানববিধাতার নির্মম সৃষ্টি প্রক্রিয়া'র প্রতিফলন এখানে পাই। চোখের বালি ৫৫টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত দীর্ঘ উপন্যাস। এর গঠন কৌশল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাসের উপযুক্ত। দীর্ঘ পরিসরে অনেক নাটকীয় মুহূর্ত এসেছে, কিন্তু লেখক সুকৌশলে নাটকীয়তা পরিহার করে সহজ সরল বর্ণনায় সেই মুহূর্তের চমককে অপ্রকাশ রেখেছেন। বিধবা বিনোদিনীর প্রেমবঞ্চিত হৃদয়ের সুপ্ত বাসনার বিস্ফোরণকেও রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে উপন্যাসের অবয়বে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তার অবরুদ্ধ কামনার তৃষাগ্নিতে মহেন্দ্র গন্ধ হয়েছে, নষ্ট হয়েছে তাদের দাম্পত্যনীড়, কিন্তু সেই কামনার আগুন থেকে প্রেমের দহনে পরিশুদ্ধ বিনোদিনী শেষপর্যন্ত আলোর সন্ধান পেয়েছে। বিহারীর প্রেমে নিজেকে আবিষ্কার করে সে দহন থেকে দীপ্তিময়ী হয়ে উঠেছে। তার চরিত্রের অভিব্যক্তি সমকালীন সমাজ বাস্তবতার প্রতিবিম্ভব। তাকে আমাদের পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু তাকে অস্বীকার করা চলে না। তার মধ্য দিয়েই নারীব্যক্তিত্বের উদ্ভাসন দেখা গেল। সমগ্র উপন্যাসের বয়ন ও নির্মাণে এই আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। একারণেই ড. নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন—

"কোনও একখানি উপন্যাস যদি কোনও সাহিত্যে উপন্যাসের প্রচলিত দর্ম ও প্রকৃতি একেবারে বদলাইয়া দিয়া নূতন যুগের সূচনা করিয়া থাকে, নূতন বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে, তবে তাহা রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'।"

৩.৫ নৌকাডুবি

চোখের বালির পরবর্তী উপন্যাস 'নৌকাডুবি' ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরবর্তী রচনা 'গোরা'। দুটি প্রধান উপন্যাস রচনার মধ্যবর্তী সময়টুকু যেন রবীন্দ্রনাথ মানসিক বিশ্রাম নিয়েছেন মনে হয়। চোখের বালির মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাজটিল আধুনিক রূপায়ণের পরবর্তী প্রয়াস হিসাবে 'নৌকাডুবি'-কে অত্যন্ত লঘু ও সরলীকৃত বলে মনে হয়। চোখের বালিতে যে অন্তর্মুখী দৃষ্টি, দুঃসাহসিক বিশ্লেষণ দেখেছি, 'নৌকাডুবি'তে তার চিহ্নমাত্র নেই। এর উদ্ভব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"নৌকাডুবি লিখতে গেলুম কী জন্যে। এসব কথা দেবা না জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। বাইরের খবরটা দেওয়া যেতে পারে, সে হল প্রকাশকের তাগিদে।.....প্রকাশকের ফরমাসকে প্রেরণা বললে বেশি বলা হয়। অথচ তাছাড়া বলব কী?"

এই কৈফিয়ৎ থেকে বোঝা যায় নৌকাডুবি রচনার জন্য লেখকের অন্তরের কোনো তাগিদ ছিল না। ফলে 'চোখের বালির' আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার পর এ কাহিনীতে ফিরে এলো রোম্যান্স প্রবণ কল্পনা দৃষ্টি। যেজন্য মহেন্দ্র-বিনোদিনী-বিহারী-আশা চতুরঙ্গের জটিল ছক এখানে রমেশ-কমলা-নলিনাক্ষ-হেমনলিনী চতুর্ভুজের সাদামাটা সমন্বয়ে পর্যবসিত। শুধু তাই নয় বঙ্কিমী পর্বের যে ঘটনা বাহুল্যকে রবীন্দ্রনাথ পিছনে ফেলে এসেছিলেন নৌকাডুবিতে তাকেই ফিরিয়ে আনলেন, যেজন্য উপন্যাসের নিয়ামক হয়ে দাঁড়ালো চরিত্র নয়—নৌকাডুবির ঘটনা। এই মূল ঘটনা-বিপর্যয়ের সূত্র ধরেই উপন্যাসে বারবার চমকপ্রদ নাট্যমুহূর্ত এসেছে। রমেশ যখন জানল কমলা তা স্ত্রী নয়, তখন এক চমক, হেনলিনী যখন জানল রমেশ-কমলা বিবাহিত দম্পতি নয় তখন আর এক চমক, কমল যখন জানল রমেশ তার স্বামী নয় তখন আরও এক চমক এবং নলিনাক্ষ যখন জানতে পারলো কমলাই তার হারানো স্ত্রী তখন শেষ চমক। এতগুলি নাটকীয় মুহূর্ত কিন্তু কোনো বিস্ফোরণ ঘটাতে পারেনি, সবটাই আপন আপন পথে সরলীকৃত সমাধানের পথ খুঁজে নিয়েছে। নলিনাক্ষকে স্বামী জানার পর কমলার চিত্তে রমেশকে নিয়ে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব বা আলোড়ন জাগলো না—এটা কি আধুনিক মননে বিশ্বাস্য বলে মনে হয়?

রমেশ হেমনলিনীকে ভালোবাসে। বাবার আদেশে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েও সে হেমকে ভোলেনি। পরে কমলা আসলে পরস্ত্রী জেনে সে হেমের কাছে মনের দিক থেকে খাঁটি থাকতে চেয়েছে। কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় কমলার কাছাকাছি এসে গেছে এবং তাকে ঘিরে রমেশের মনে এক অন্তর্লীন অনুরাগের জন্ম হয়েছে। ঠিক তখনি ঘটনাচক্রে কমলা জানতে পারে রমেশ তার স্বামী নয়। এই ঘটনা তাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এক দুর্যোগের ঘনঘটায় নৌকাডুবির ফলে দুটি চরিত্র অত্যন্ত কাছাকাছি এসেছিল—অন্যতর ঘটনায় তারা আবার কক্ষচ্যুত উল্কার মত পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। কমলা শেষপর্যন্ত তার স্বামী নলিনাক্ষর কাছে আশ্রয় ও প্রেম খুঁজে পেল। রমেশ হেমনলিনীর সঙ্গে মিলিত হবে এমন সম্ভাবনার পথও হয়তো খোলা রইল। তার আগে রমেশ ও কমলার শেষ সাক্ষাৎকার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব জটিল হতে পারতো—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেদিকে গেলেন না। রমেশের জন্য একুট বেদনা করুণ ছোঁয়া পাঠক মনে লাগতে পারে হয়তো, তবু বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রতাপ-শৈবলিনী কিংবা 'রজনী' উপন্যাসের অমরনাথ-লবঙ্গলতার শেষ সাক্ষাৎকারে মত অনবদ্য রূপায়ণ হয়ে উঠতে পারেনি।

কমলা ও হেমনলিনী-প্রধন দুই নারী চরিত্র লেখকের সযত্ন সৃষ্টি। একটি সরলা গ্রাম্য বালিকা ও একটি আধুনিক শিক্ষিতা তরুণীর পরিচয় ও প্রকৃতি স্পষ্ট রেখায় প্রকাশ পেয়েছে। হেমনলিনী পরিশীলিত অভিজাত রবীন্দ্র নায়িকা যার মধ্যে কলকাতার নব্যরুচির অলোকপ্রাপ্তা নারীর দেখা পাই, পরবর্তী সুচরিতা, লাবণ্যের মধ্যে যার পূর্ণতার বিকাশ।

সমকালীন কলকাতার সম্পন্ন ব্রাহ্মপরিবারের নিদর্শন হিসাবে অন্নদাবাবুর পরিবারকে উপন্যাসে আনা হয়েছে। পরবর্তী 'গোরা' উপন্যাসে পরেশবাবুর পরিবারে যে চিত্র আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে—যেন তারই আভাস নৌকাডুবিতে দেখা গেল।

৩.৬ গোরা (১৯১০)

মহাকাব্যিক উপন্যাস হিসাবে 'গোরা'র খ্যাতি-পরিচিতি। স্বজাত্যবোধের সংকীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে গোরা উত্তীর্ণ হয় বিশ্বাত্মবোধে। এত ব্যাপক প্রসার ও ভাবকল্পনার ব্যাপ্তি, জীবনদর্শনের গভীর সামগ্রিক দৃষ্টি আর কোনো বাংলা উপন্যাসে দেখা যায়নি। এই উপন্যাসে যে সমগ্রতার ধর্ম ও বৃহত্তর ঐক্যের কথা প্রকাশিত তারই মহিমময় ব্যাপ্তিতে এ কাহিনীর মর্যাদা ও তাৎপর্য।

'মানুষের ধর্ম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "মানুষ আপন-উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎ মানুষ হয়ে উঠছে,
> তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎ মানুষের সাধনা"

—'গোরা' উপন্যাসে বৃহতের বোধেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতার এই উপলব্ধিকে রূপায়িত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে বিশ্বমানবতার আদর্শই এ উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। লেখক গোরা চরিত্রে ভারত বোধ থেকে বিশ্ববোধ, জাতীয়তাবাদ থেকে আন্তর্জাতিকতার উত্তরণ দেখিয়েছেন।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক সামাজিক ঘটনাবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সেই সময় ও পটভূমিতে এই কাহিনী রচিত হয়েছিল। ঐ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া গোরা রচনার উৎসে কাজ করেছে, যদিও গোরার রচনাকাল থেকে বেশ কিছু বছর আগে কাহিনীটি স্থাপিত। লেখক গোরার জন্ম সিপাহী বিদ্রোহকালে অর্থাৎ ১৮৫৭-তে বলেছেন এবং কাহিনীতে গোরার বয়স ২২/২৩। সে হিসাবে ১৮৮০ সাল নাগাদ সময় কাহিনীর কাল। সেসময়ের শিক্ষিত যুবক গোরার মধ্যে স্বাদেশিকতা ও ইংরেজবিরোধিতা যেমন সতেজ ছিল, তেমনি প্রবল ছিল হিন্দুত্ব ও ভারতচেতনা।

নায়ক গোরা ও তার বন্ধু বিনয় হিন্দু আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং ভারত হিতৈষণা তাদের জীবনের ব্রত। বিনয় ঘটনাচক্রে ব্রাহ্ম পরেশবাবুর পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুচরিতার পরিশীলিত স্বভাব ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ। গোঁড়া উগ্র হিন্দু গোরা ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত মানুষদের সঙ্গে বিনয়ের মেলামেশা পছন্দ করে না। কিন্তু ঘটনাচক্রে গোরাও ঐ ব্রাহ্মপরিবারে যাতায়াত করে এবং সুচরিতার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। সে পরিচয় হৃদয় সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দুটি চরিত্রকেই বিকশিত করে।

দেশকাল ও সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গভীরতর জীবনসত্যের অন্বেষণই গোরা উপন্যাসের বিষয়। হিন্দুধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম কেন্দ্রিক বিরোধ দুটি পরিবারকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। প্রধানত গোরা চরিত্রে যে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুয়ানীর প্রকাশ দেখি তার আবরণ ছিন্ন হয় গোরার জন্মপরিচয় উদঘাটনে। মা আনন্দময়ীর মুখে তার বিদেশী উত্তরাধিকারের বৃত্তান্ত শোনার মুহূর্তে গোরা অনুভব করেছে তার দেশানুরাগ সমাজ প্রচলিত আচার ব্যবহারের আজন্ম বিশ্বাস্য ভিত্তি ভূমি মিথ্যা অলীক। তার প্রথম প্রতিক্রিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদগীরণের মতই তীব্র এবং স্বাভাবিক—"মা তুমি আমার মা নও?"

—কিন্তু পরক্ষণেই সংযত, অন্তর্মুখী তার আচরণ। সে সুচরিতার উদ্দেশ্যে পরেশবাবুর কাছে গেছে। রবীন্দ্রনাথ জানতেন বিশেষ সমাজ ও শ্রেণীর মধ্যে গোরাকে আবদ্ধ রাখলে তার মধ্যে তাঁর পরিকল্পিত বিপ্লবীমানসের ধর্মাদর্শ সঞ্চারিত করা সম্ভভব নয়। হিন্দু সমাজের মধ্য থেকে তাকে সরিয়ে এনেই সেই গোঁড়ামির বিলুপ্তি সম্ভভব। গোরাকে জন্মসূত্রে বিদেশি করে তার মোহমুক্তি ঘটিয়ে উদারবিশ্বে তাকে মুক্তি দেওয়া সহজ হয়েছিল। তাই জননী আনন্দময়ীর মধ্যে সে প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্বমানবতার মূর্তি, বলেছে "মা, তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"

এই ঘটনাবহুল উপন্যাসে মুখ্যত উনিশশতকের শেষার্ধের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক ঘটনার উপস্থাপনা ও আলোচনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন চরিত্র বিশ্লেষণ করে মানবতাবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সঙ্গে গোরা-সুচরিতা, বিনয়-ললিতা যুগ্ম প্রেমকাহিনীর মধ্য দিয়ে সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে মানবহৃদয়ের প্রেমের গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুচরিতার সঙ্গে গোরার মিলন শুধু বিবাহমাত্র নয়, তা বৃহত্তর জীবনাদর্শের মধ্যে মুক্তি। গোরা উপন্যাসের প্রতিটি প্রধান চরিত্রের মধ্যেই এই বৃহত্তর জীবন বিকাশের ধারা লক্ষ্য করা যায়। গোরা, সুচরিতা, বিনয়, ললিতা ছাড়া যে দুটি চরিত্র উল্লেখযোগ্য প্রাধান্য পেয়েছে। তারা হলেন আনন্দময়ী ও পরেশবাবু—গোরার মা ও সুচরিতার পিতা। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে কোনো সম্বন্ধই রক্তের বন্ধন নয়। গোরার জন্মদাত্রী জননী আইরিশ মহিলা, গোরার জন্মকালেই তাঁর মৃত্যু হয়। আনন্দময়ী গোরাকে প্রকৃত মাতৃস্নেহে পালন করেছিলেন। অনুরূপভাবে পরেশবাবুও সুচরিতার পিতা নন, কিন্তু স্নেহে পিতারও অধিক। দুটি চরিত্রের মধ্যেই লেখকের বিশিষ্ট আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত পরেশবাবুকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপন ধর্মোপলব্ধির মুখপাত্র হিসেবে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

আনন্দময়ীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টি ও চিত্তমুক্তির আলো বিচ্ছুরিত করেছেন। ইউরোপীয় দম্পতির সদ্যোজাত সন্তান গোরাকে নিজের বলে গ্রহণ করার মধ্যে তাঁর উদার হৃদয় প্রকাশিত। সংকীর্ণ সীমার ঊর্ধ্বে যে বিশ্বমানবতার অসীম মুক্তি তারই প্রতীকিত বাণীমূর্তি যেন আনন্দময়ী। তাই গোরার চরম উপলব্ধি ঘটেছে তাঁরই মাতৃমূর্তির আশ্রয়ে—যখন মা-র মধ্যে খুঁজে পেয়েছে মাতৃভূমিকে, যখন আনন্দময়ী তার কাছে ভারতবর্ষের প্রতিমা রূপে অনুভূত হয়েছেন। গোরার চিত্তমুক্তিতে আনন্দময়ীর জীবনভাবনা ও সত্যদৃষ্টির অবদানত আছে।

৩.৭ চতুরঙ্গ (১৯১৬)

'সবুজপত্র' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের সময় এটি 'চতুরঙ্গ' নামে বিজ্ঞাপিত হয়নি। পরপর সাতটি অনবদ্য ছোট গল্প সবুজপত্রে প্রকাশিত হবার পর 'জ্যাঠামশায়' প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সংখ্যায় 'শচীশ' প্রকাশের পর বোঝা যায় এটির পূর্বাপর অংশ আছে এবং ক্রমান্বয়ে 'দামিনী' ও শ্রীবিলাস' পর্ব প্রকাশে চারটি পর্যায় সম্পূর্ণ হয় এবং গ্রন্থাকারে চারটি অংশ সমন্বিত হয়ে 'চতুরঙ্গ' নামে উপন্যাস আত্মপ্রকাশ করে। এটির উল্লেখযোগ্য বিষয় এর ভাষা ও বাকরীতি। 'চতুরঙ্গ'-ই সাধুভাষায় রচিত রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস। একই বছরে রচিত 'ঘরে-বাইরে' রবীন্দ্রনাথের লেখা চলিত ভাষার প্রথম উপন্যাস। 'চতুরঙ্গ'-র ভাষা সাধুভাষা হলেও এর রীতিও ভঙ্গিতে চলিতভাষার মুক্তি অনুভব করা যায়।

'চতুরঙ্গ' নায়ক শচীশের আত্মানুসন্ধানের কাহিনী। সে তার নাস্তিক জ্যাঠামশায় জগমোহনের শিষ্য। ম্যালথাস ও বেন্থামের ভাবশিষ্য জ্যাঠামশায় 'পজিটিভিস্ট'। 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন'ই তাঁর জীবনের আদর্শ।

জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুতে শচীশের কর্মবাদের ধারা শুকিয়ে গেল। সে আশ্রয় নিল লীলানন্দস্বামীর রসসমুদ্রে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেখান থেকেও তার বিদায় গ্রহণ। অতিরিক্ত কর্ম মানুষকে শুষ্ক করে তোলে আর অতিমাত্রায় রসে মানুষের মন রস স্রোতে ডুবে যায়। কোনোটাই সত্য আশ্রয় নয়। লীলানন্দর আশ্রয়েই শচীশ দেখা পায় 'দামিনী'র। 'দামিনী' রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য সৃষ্টি। 'চোখের বালির' বিনোদিনীরই অন্যতর, পরিণততর প্রকাশ দামিনী—

বিনোদিনীর দ্বিধামুক্তি যেন তার মধ্যে দেখি। শচীশের প্রতি দামিনীর আকাঙ্ক্ষা ও আকর্ষণ উপন্যাসে গতি সঞ্চার করেছে। শচীশ তার সাধনার বিঘ্ন হবে বলে দামিনীর আকর্ষণে সাড়া দেয়নি। কিন্তু দামিনীকে অস্বীকার করতেও পারেনি। জ্যাঠামশায়ের নির্দেশে বিধবা ননীবালাকে কলঙ্ক মুক্ত করতে সে তাকে বিবাহে রাজী হলেও ননীবালা আত্মহত্যা করে সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। দামিনী কিন্তু অন্য ধাতুর। শচীশের উপলব্ধি " সে মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক।"

শচীশের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি তত্ত্বকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। মানুষের আসল আশ্রয় কর্মবাদ বা রসবাদে নয়, তার আপন ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ই তার শক্তি। শচীশের সাধনায় দামিনী যেন বাধা ও তীব্র প্রতিবাদ। তাই শচীশ শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে মুখ ফিরিয়েছে।

গুহার দৃশ্যে নিদ্রিত শচীশ নিবেদিতা দামিনীকে আঘাত করেছে। তার সেই আঘাতই দামিনীর কাছ গোপন ঐশ্বর্য—পরশমণি। প্রত্যাখ্যাতা দামিনী শ্রীবিলাসকে বিবাহ করেছে কিন্তু শচীশের দেওয়া আঘাতের বেদনাকে নিঃশব্দে বহন করে গেছে। আমরণ।

অনেকেই মনে করেন 'শচীশ' রবীন্দ্রতত্ত্বের বাহন। শচীশের নিজেরই উক্তিতে এর স্বপক্ষে সমর্থন মেলে। শচীশ বলেছে—"তিনি রূপ ভালোবাসেন তাই কেবলি রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচিনা, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত তাই তাঁর লীলা বন্ধনে, আমরা বদ্ধ সেই জন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে।"

শচীশের এই উপলব্ধি আধ্যাত্মিকজাতীয় এজন্য অনেকে 'চতুরঙ্গ'-কে রূপক বলতে চেয়েচেন। শচীশের মানস পরিক্রমা এ উপন্যাসের মূল বিষয়। কিন্তু শেষাংশে দামিনীও প্রধান হয়ে উঠেছে। ড. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত চতুরঙ্গকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—"নানা শচীশের একখানি মালা" এবং এ মালা দামিনীর প্রাপ্য বলেও মত প্রকাশ করেছেন।

শ্রীবিলাস এ কাহিনীর কথক। তারই কতকতার সূত্রে শচীশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তার আইডিয়ার তত্ত্ব থেকে দামিনী প্রকাশিত হয়েছে পূর্ণ মানবী মূর্তিতে। জ্যাঠামশায়কেও পাঠক চিনেছে শ্রীবিলাসের উপলব্ধিতেই।

চতুরঙ্গের রচনাশৈলী অভিনব। এটি আত্মকাহিনী নয়, নয় ডায়েরি বা দিনলিপি। আবার পাত্রপাত্রীরা নিজের নিজের বক্তব্য নিজেরা বলেনি, যেমনটি দেখবো পরবর্তী উপন্যাস ঘরে-বাইরে অথবা পূর্ববর্তী বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনীতে'। এখানে শ্রীবিলাস একাই কথক। শচীশ, দামিনী, জ্যাঠামশায় এবং নিজের কথা সে একাই বলেছে। মাঝে মাঝে অন্য চরিত্রের অন্তর্লোক উদঘাটন করতে গিয়ে তাকে ডায়েরির আশ্রয় নিতে হয়েছে।

"চতুরঙ্গ' নামকরণটিও নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। চারটি চরিত্র নামাঙ্কিত বলে এর এহেন নামকরণ। আবার শচীশের চারটি মানসিক অবস্থা—(কর্মবাদ, রসবাদ, নারীপ্রেম ও সর্বউত্তীর্ণ অবস্থা) ভেবেও এ নামকরণ হতে পারে 'চতুরঙ্গ' বা 'সতরঞ্জ' জাতীয় খেলার ছকের প্রতীক হিসেবেও এই জীবনধর্মী কাহিনীকে ধরে নেওয়া যায়। এ কাহিনীতে চারটি 'মৃত্যু'-র উল্লেখ আছে, যাদের অভিঘাত নায়ক শচীশের আত্মসমীক্ষা ও আত্মউপলব্ধির সহায়ক। জ্যাঠামশায়, ননীবালা, নবীনের স্ত্রী এবং সবশেষে দামিনীর মৃত্যু সবই শচীশের জীবনপথে এক একটি স্তর চিহ্নিত করেছে।

বিষয়বস্তু, গল্পাঙ্গিক, ভাষারীতি, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সবের সমন্বিত রূপ হিসাবে 'চতুরঙ্গ' অন্যন্য উপন্যাস। অনেকে এর ক্রমভঙ্গ রীতির জন্য একে আংশিকের লক্ষণাক্রান্ত বলতে চান কিন্তু এর রূপ-অরূপ তত্ত্বের মানবিক প্রয়োগের অসাধারণত্ব স্বীকার করতেই হয়। অধ্যাপক ড. ক্ষেত্র গুপ্তের মন্তব্য উদ্ধৃত করে আমরাও সহমত হতে পারি যে—

"রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে ভালো লেখাগুলির একটি চতুরঙ্গ। আকাশের মুক্তি এবং শোকসুখমিশ্র মাটির অমৃতকে তিনি একটি মানবিক কাহিনীতে অভিনব শিল্পাঙ্গিকে ধরে রেখেছেন।"

৩.৮ ঘরে বাইরে (১৯১৬)

'চতুরঙ্গ' সমকালে লিখিত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ প্রথম আগাগোড়া চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। রচনারীতির দিক থেকেও নতুনতর আঙ্গিক প্রয়োগ করেছেন। চতুরঙ্গে শ্রীবিলাস নিয়েছিল কথকের দায়িত্ব। ঘরে-বাইরে উপন্যাসে প্রধান চরিত্রগুলি নিজেরাই বলেছে নিজেদের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রজনী' উপন্যাসে এই পদ্ধতি আগেই প্রয়োগ করেছিলেন।

'ঘরে-বাইরে উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে রাজনীতির আভাস। এর আগে 'গোরা' উপন্যাসের বিশাল মহাকাব্যিক ক্যানভাসে রাজনীতি এসেছিল। পরবর্তী 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে সেই প্রয়োগ সচেতন ও সোচ্চার। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই 'ঘরে-বাইরে' কে নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আলোচনা বাদানুবাদ শুরু হয়েছিল। এর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, লেখকের রাজনৈতিক মতবাদ বিশেষত সন্দীপ চরিত্রায়ণ নিয়ে দীর্ঘ বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের তরঙ্গঘাতে এ উপন্যাসের পটভূমি উত্তাল। দেশব্যাপী রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য ও ভাবাকুলতাকে এ কাহিনীতে রূপ দিয়েছেন লেখক। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে এর সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পরে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, সন্ত্রাসবাদের উত্তেজনা তাঁর কাছে হুজুগ বলে মনে হয়েছিল। ঘরে আলো জ্বালাবার জন্য অগ্নি সংযোগের প্রবণতাকে তিনি অকারণ ধ্বংসের নেশা বলে মনে করেছিলেন।

নিখিলেশ চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুভকামী, প্রশান্ত, স্থির আদর্শ এক মানুষকে এঁকেছেন—যার দাম্পত্য প্রেম ও দেশপ্রেম মঙ্গল ও শুভবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশধর্ম ও মানবিক ধর্মের বিরোধে রবীন্দ্রনাথ মানবতার জয়কেই স্বীকার করেছেন। এখানেই সন্দীপের দেশপ্রেমের থেকে তার বোধ স্বতন্ত্র।

এই দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতির পুরুষের বিপরীতমুখী আকর্ষণ বিকর্ষণের দোলায়িত ভাবনায় বিমলার চিত্তসংকট ঘনিয়ে এসেছে। স্বামীর প্রতি বিমলার মনে প্রথমাবধি ছিল ভক্তি মিশ্রিত প্রেমানুরাগ। সে বলেছে—

"আমার স্বামী বলে এসেছে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ" নিখিলেশ তার স্ত্রীকে ঘরের চার দেওয়াল থেকে মুক্ত করে বাইরে এনে দাঁড় করিয়েছে। তার বিশ্বাস বাইরে এসেই স্বামী স্ত্রীর যথার্থ আত্মআবিষ্কার সম্ভব। বাইরে এসে বিমলা সন্দীপকে প্রথম দেখায় পছন্দ করেনি। কিন্তু তার অগ্নিগর্ভ বক্তৃতার প্রতিক্রিয়ায় তার ভেতরে ভেতরে ভাঙচুর শুরু হয়েছে। বীরপূজার গৌরব ও উত্তেজনায় তার আবেগ হয়েছে বাঁধনহারা।

> "সেদিন একটা অপূর্ব আনন্দ ও অহংকারের দীপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম। ভিতরে একটা আগুনের ঝড়ের বেগ আমাকে এক মুহূর্তে এক কেন্দ্র থেকে আর এক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেল"

সন্দীপের প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ ও উচ্ছ্বাসের তুলনায় বিমলার মনে হয়েছে নিখিলেশ নিরত্তাপ ও দুর্বল। সন্দীপের স্তুতিবাদে সে মুগ্ধ ও মোহাবিষ্ট হয়েছে। নিজেকে যেন নতুনভাবে আবিষ্কার করেছে এবং আপন অজ্ঞাতেই সন্দীপের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ ছুটে গেছে। নিখিলেশের কাছ থেকে কখন যে সে অনেক দূরে সরে গেছে—সে নিজেও বোঝেনি। অথচ একসময় সন্দীপের বিকৃত রূপের পরিচয় বুঝেও সে আত্মসংবরণ করতে পারেনি। পতঙ্গের মত সন্দীপের বহ্নিময় উত্তাপে দগ্ধ হয়েছে। তার এই আত্মসংকট ও তার আবর্তে ঘুরে ফেরাই উপন্যাসের উপজীব্য। এই সংকটের বীজ তার চরিত্রেই ছিল। তাই নিখিলেশ বলেছে—

> "ধৈর্যের পরে বিমলার ধৈর্য নেই। পুরুষের মধ্যে সে দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ এমন কি অন্যায়কারীকে দেখতে ভালোবাসে। শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা ভয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন তার মনে আছে।"

কিন্তু সন্দীপকে ঘিরে বিমলার মোহভঙ্গ তার চরিত্রেরই অন্য দিক। আকস্মিক ঝড়ের মত সন্দীপ তার চিত্তাকাশ আলোড়িত করলেও তার থেকে বেরিয়ে আসার পথ সে নিজের মধ্যেই খুঁজতে চেয়েছে তখনই অমূল্যের আবির্ভাবে সে কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে এসেছে। একই সঙ্গে সন্দীপের অর্থলোলুপতা ও অসংযমী চিত্তের নিরাবরণ প্রকাশে তার মোহাবেশ ছিন্ন হয়েছে। অমূল্যকে কেন্দ্র করে তার স্নেহ ও শুভবোধতাকে পুরাতন পথে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। স্বামীর সিন্দুক থেকে সন্দীপের জন্য টাকা চুরি করতে গিয়ে তার মন যে ন্যায়নীতির বোধ ও অনুশোচনার দংশন হয়েছে তার মধ্যেই নিহিত ছিল তার মোহভঙ্গের বীজ।

গৌণ চরিত্রে মধ্যে মেজরানী, চন্দ্রনাথবাবু ও অনূল্য লেখকের সৃষ্টিকুশলতার নিদর্শন।

বিমলার সন্দীপকেন্দ্রিক মোহভঙ্গে কোনো না কোনোভাবে এদের প্রভাব কাজ করেছে। অমূল্য চরিত্র এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, অবশ্যই বিমলার আত্মবীক্ষণ তাকে ফিরে আসতে সাহায্য করেছে। অপরাধবোধে পীড়িত হৃদয় নিয়ে সে ফিরতে চেয়েছেন' বছর আগেকার দিনে—যেদিন চন্দন চেলি পরে এক নবভধূ এসে দাঁড়িয়েছিল নিখিলেশের পাশে। সে যখন আপনমনে বলে—

> "আজ আমি এই যে টাকা চুরি আনলুম, এও তো টাকা চুরি নয়, এ যে আকাশের চিরকালরে আলো চুরিরই মতো—এ চুরি সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি বিশ্বাস চুরি, ধর্ম চুরি।"

—তখনই মনে মনে তার আত্মদহন শুরু, শুরু মানসিকভাবে ফিরে আসার সম্ভাবনা। শেষ পর্যন্ত বিমলার অনুতাপ ও বেদনার আঁখিজলে নিখিলেশের উদার প্রশান্ত প্রেমের শুভবোধে ওদের মিলন ঘটেছে।

৩.৯ যোগাযোগ (১৯২৯)

'চোখের বালি' রচনার আগে ছিল দীর্ঘ ১৬ বছরের নীরবতা। রাজর্ষির (দ্বিতীয় উপন্যাসের) পর তৃতীয়টি রচিত হয়েছিল এই দীর্ঘ ব্যবধানে। চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরের পর আবার দীর্ঘ বিরতি। তেরো বছর পর 'যোগাযোগ' প্রকাশিত হয়।

রবীনদ্র উপন্যাসও তাঁর কাব্য কবিতার মত তত্ত্বাশ্রয়ী এমন ইঙ্গিত অনেকেই করে থাকেন। বিশেষত তাঁর শেষ পর্বের উপন্যাস দুই বোন, মালঞ্চ, শেষের কবিতায় এই তত্ত্বভাবনা স্পষ্ট প্রকাশিত। এই মন্তব্যের যোগ্য উত্তর—যোগাযোগ।

১৯২৯-এ প্রকাশিত এই উপন্যাসে তত্ত্ববিনির্মুক্ত সমাজচিত্রণ লক্ষ্য করা যায়। এর চরিত্রগুলি বিশিষ্ট সমাজজীবনের আদর্শে গড়ে উঠেছে। সমাজজীবনের সন্ধিলগ্নের এই উপন্যাসে এই নৈতিক শ্রেণীবিন্যাসের ছবিটি স্পষ্ট।

গল্পটির অন্তরঙ্গ জীবনভাবনায় আছে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সংকট। কুমুদিনী ও মধুসূদনের অন্তর্বিরোধ এ উপন্যাসের মূল বিষয়। কিন্তু কুমু ও মধুসূদনের বিরোধ অকেটাই বিপ্রদাস ও মধুসূদনের বিরোধ—আরো বিশদভাবে বলতে গেলে দুটি শ্রেণীর বিরোধ। সেই শ্রেণী বিরোধের উৎস দুই পরিবারের বংশগত বিরোধ।

তাই দাম্পত্য সমকট যা একটি পরিবারের ঘটনা তার প্রেক্ষিত পরিবার ছাড়িয়ে সমাজকে ছুঁয়েছে, ব্যক্তিদ্বন্দ্ব ব্যাপ্তি পেয়েছে শ্রেণীদ্বন্দ্বে। রবীন্দ্রনাথ এভাবেই নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতাকে আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে পৌঁছে দিয়েছেন।

নূরনগরের চাটুয্যে পরিবার অর্থ প্রতিপত্তির চূড়ান্ত শীর্ষে ছিল—আজ তাদের পতনোন্মুখ অবস্থা। অন্যদিকে বাণিজ্য লক্ষ্মীর অকৃপণ আশীর্বাদে সদ্য ফেঁপে ওঠা নব্য ধনী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মধুসূদন। নূরনগরের অভিজাত বিপ্রদাসের সঙ্গে তার সংঘর্ষ।

মধুসূদন ঘোষাল কিছুটা জেদের বশে নূরনগরের চাটুয্যে পরিবারে বিবাহ করেছে—অর্থের কৌলীন্যে আভিজাতকে ক্রয় করতে চেয়েছে। কিন্তু মন তো বাজর দরের হিসেবে চলে না। তাই কুমু তার ঘরে এলেও মনেতে প্রবেশ করেনি। দুজনের অন্তর্বিরোধের প্রকৃতি এমনই যে তাদের মেলা সম্ভব ছিল না, বণিকবুদ্ধি বস্তুলোভী মধুসূদনের কাছে কুমুদিনী তার নিত্য ব্যবহার্য আসবাবপত্রের মত। নব্য ঐশ্বর্যমদমত্ত মধুসূদন কুমুকে স্ত্রী হিসাবে চেয়েছ শুধু তার বংশ গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সেখানে হৃদয়বৃত্তির কোনা আলোড়ন বা উচ্ছ্বাস ছিলনা, শুধু ছিল উদ্ধ্যত প্রভুত্ব স্পৃহা। স্বামী সম্বন্ধে কুমুদিনী বাল্যকাল থেকে যে ধরাণা পোষণ করে এসেছে তার সঙ্গে মধুসূদনের আচার-আচরণের কোনও মিলই ছিল না। কুমুদিনীর সঙ্গে মধুসূদনের বিরোধের প্রকৃত ইতিহাস এই। বংশগৌরব প্রতিষ্ঠার সংকল্প প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার নির্মম ক্রুরতা ও ধনগর্ব এবং প্রভুত্ব বিস্তারের লোলুপতা মধুসূদন চরিত্রকে ঘিরে আছে। নারী সম্পর্কে তার ধারণায় কোনো মোহ বা মাধুর্য ছিল না। তাঁর চরিত্রের মধ্যেই বিবাহোত্তর জীবনের বিপর্যয়ের বীজ নিহিত। কুমুদিনীর সূক্ষ্ম হৃদয়বোধ মধুসূদনের স্থূল বোধের কাছে বারবার আঘাত পেয়েছে। তাদের দুজনের মানস বিচ্ছিন্নতা দাম্পত্যক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অভিশাপ ও অনতিক্রম্য ব্যবধান হয়ে দেখা দিয়েছে। এই জটিলতা অবশ্য শেষাংশে কুমুর সন্তানসম্ভভাবনায় অনেকটাই সরলীকৃত সমাধান খুঁজে পেয়েছে।

এ উপন্যাসের নামকরণ লক্ষণীয়—এ কারণে যে পত্রিকায় ধারাবাহিকতা প্রকাশকালে এর নাম প্রথমে ছিল 'তিনপুরুষ', পরে 'যোগাযোগ' নামে ঘটলো পরিণতি। আসলে 'তিনপুরুষ' থেকে 'যোগাযোগ' নাম পরিবর্তনের মধ্যে গল্পের বস্তুর চেয়ে রূপের আকর্ষণই প্রবল হয়েছিল। এই নাম বদলের মধ্যেই উপন্যাসটির আন্তরধর্মের এক বড় পরিচয় বয়ে গেছে। 'তিনপুরুষ'-এ যে কাহিনীর বিস্তার 'যোগাযোগ' তা সংহত। আবার 'তিনপুরষ' নামকরণে যে ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাস—যোগাযোগ নামকরণে সেই বহিরঙ্গ ক্রমের পরিবর্তে অন্তরঙ্গ সেতুর আভাস। এ প্রসঙ্গে 'নামান্তর' নামে একটি কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—

> "গল্পের এমন নাম দেওয়া উচিত নয় যেটা সংজ্ঞা অর্থাৎ যেটাতে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দিষ্ট।..... তিনপুরুষের তিন তোরণওয়ালা রাস্তা দিয়ে গল্পটা চলে আসবে, এই আমার একটা খেয়াল মাত্র ছিল। এ চলাটা কিছুই প্রমাণ করবার জন্য নয়, নিছক ভ্রমণ করবার জন্যই।"

এ কাহিনীর প্রধান তিনটি চরিত্র চিত্রণে রবীন্দ্রনাথ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণরীতি প্রয়োগ করেছেন। মূলত দাম্পত্য সংকটের কাহিনী হলেও বিপ্রদাস এর অন্যতম প্রধান চরিত্র। রুচিবোধ ও আভিজাত্যে মহিমময় বিপ্রদাস চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদের প্রতিরূপ দেখি। বনেদী জমিদারকুলের আভিজাত্য গর্বের পরাজিত বেদনার পাশে ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের আর্থিক কৌলীন্যের শক্তিমত্তা দেকালেও রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত যে ছিল ঐতিহ্যবাহী পরাজিত ভূস্বামীদের প্রতি তা বোঝা যায়। তাই উপন্যাসে নব্য ধনী ব্যবসায়ী মধুসূদন ঘোষালের পাশে অস্তমিত অভিজাত গরিমার প্রতিনিধি বিপ্রদাসের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ মমতা প্রকাশ পেয়েছে। পাশাপাশি অনভিজাত নব্য ধনী মদুসূদন ঘোষালকে তিনি যেন সচেতনভাবে স্থূল, অহংকারী, মদমত্তরূপে চিত্রিত করেছেন।

কেন্দ্রীয় চরিত্র কুমুদিনী মধুর ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যের প্রতীক। তার সঙ্গে পূর্ববর্তী হেমনলিনী, সুচরিতা ও পরবর্তী লাবণ্য চরিত্রের আত্মিক সম্পর্ক আছে। তবু কুমুদিনী আপন স্বরূপে অনন্যা।

গৌণ চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—নবীন, মোতির মা এবং অবশ্যই হাবুল। ঘোষাল বাড়ির বদ্ধ পরিবেশে নবীন ও তার স্ত্রী ছিল কুমুর মনের খোলা জানলা আর হাবুল ছিল সে মুক্ত বাতায়ন দিয়ে দেখা একটুকরো নীলাকাশ। কুমুর মানসমুক্তির ক্ষেত্রে এদের অবদান স্মরণীয়। এর বিপরীতে স্থাপিত শ্যামা উল্লেখ্য এক নেগেটিভ চরিত্র।

'যোগাযোগ' একটি বৃহৎ সাগা জাতীয় রচনা হয়ে ওঠার সম্ভভাবনা ছিল। 'তিনপুরুষ' নামকরণ ও সূচনায় তৃতীয় পুরুষ অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিনের বর্ণনার মধ্যে সেই দীর্ঘায়িত বিশাল ক্যানভাসের সম্ভাব্য আভাস মেলে। কিন্তু শেষপর্যন্ত অসম্পূর্ণতার লক্ষণ নিয়ে যেন উপন্যাসটিকে সমাপ্ত করা হয়েছে। শোনা যায় এর পরবর্তী একটি খণ্ড লেখার অভিপ্রায় ছিল রবীন্দ্রনাথের, যদিও সেটি সম্ভব হয়নি, সুতরাং এক বৃহৎ অলিখিত উপন্যাসের প্রথমার্ধ বলে একে মনে হয়, যদিও রসগ্রহণে অসুবিধা হয় না, তবে এর আকস্মিক সমাপ্তি নিয়ে মনে একটা অতৃপ্তজনিত বেদনাবোধ হয়।

৩.১০ শেষের কবিতা (১৯২৯)

যোগাযোগের সমকালে রচিত 'শেষের কবিতা' সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী রচনা। বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে এটি 'যোগাযোগ' থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। লেখক সমকালীন আভিজাত্যের একটি স্তরকে এ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। সমালোচকের মতে 'শেষের কবিতার' বৈশিষ্ট্য "এর অপূর্ব মধুর কাব্যরস, বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত বাকভঙ্গি, ভাষার উজ্জ্বল ও তির্যক গতি, অপূর্ব বর্ণবিলাসময় ভাব পরিবেশ।"

অমিত-লাবণ্যর অসামান্য প্রেমকাহিনী শিলং-এর পাহাড়ী পাথর প্রেক্ষাপটে স্থাপিত। এই কাব্যধর্মী উপন্যাস তার অবয়বে ও আত্মার ধরে রেখেছ চরম রোম্যান্টিকতা।

নায়ক অমিত অতি আধুনিক ইঙ্গবঙ্গীয় সমাজের একজন। এরা কলকাতার অভিজাত বংশীয়, বিলেতে লেখাপড়া করার সুযোগ পায়, ধনাঢ্য বংশের সন্তান, মাতৃভাষার চেয়ে ইংরেজি ভাষায় সহজ। এদের দিকেই রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টি দিলেন। কিন্তু অন্তঃসারশূন্য আধুনিকতার নির্মোক সরিয়ে হৃদয়বত্তার পরিচয়ও রাখলেন—কেটির চরিত্রে তারই প্রমাণ মেলে।

শেষের কবিতার কাহিনী গড়ে উঠেছে অমিত-লাবণ্যর প্রেমকে কেন্দ্র করে। শৈলশহর শিলং-এর পথ তাদের বেঁধেছিল বন্ধনীর গ্রন্থিতে। তাদের প্রেমকে রবীন্দ্রনাথ অসামান্য রোম্যান্টিক মাধুর্য প্রকাশ করেছেন। তাই ঘটনার ঘনঘটা নয় কবিতার ছন্দোময়তায় কাহিনী এগিয়ে চলেছে। অমিত লাবণ্যর প্রেম যখন পরপূর্ণতার দিকে অগ্রসরমান তখন তার আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে কেটি মিত্রের অশ্রুজল, শোভনলালের বেদনা। অমিতের অতীত প্রেম কেটি আর লাবণ্যর অতীত স্মৃতি শোভনলাল—দুজনেই শেষ বর্তমানে উদ্ভাসিত হয়। তবে সেই অদূর অতীত নয়-শিলঙের পথে অমিত লাবণ্যর বর্তমানের প্রেমই কাহিনীর মূল বিষয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই প্রেমে রেখে গেলেন এক মুক্তির বার্তা। প্রেমের বন্ধনেও বাঁধা নয় যে হৃদয়, সেই স্বাধীন মুক্ত হৃদয়ের কথাই শোনা গেল এ উপন্যাসে। তাই সমালোচক যথার্তই মন্তব্য করেন—

> "একই পুরুষ বা নারীর একজনকে ভালোবাসা, অন্যকে বিয়ে করা, অতবা একই পুরুষ বা নারীর একজনের সঙ্গে গভীর প্রেমে আত্মহারা অবস্থায় আপনার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অন্যের প্রতি প্রেম অন্তরে পোষণ করার যে- ছবি লেখক শেষের কবিতায় এঁকেছেন, তার চেয়ে মুক্ত হৃদয়ের বার্তা আর কি হতে পারে?"

এর থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনার মুক্তি-বন্ধন তত্ত্ব এসেছে। অমিতের কাছে কেটি বন্ধন আর লাবণ্যমুক্ত প্রেমের বন্যাধারা। একেই স্পষ্ট করতে লেখক 'ঘড়ার জল আর দীঘির জলের' তত্ত্ব বার করেছেন। অমিত লাবণ্যর বিচ্চেদের পর অমিত তাই বলেছে—

> "একদিন আমি সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ—আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি, কিন্তু আমার আকাশও রইলো।"

অমিত ও লাবণ্যই এ কাহিনীর প্রাণ। সঙ্গে আছে 'কেটি' ও শোভনলাল। গৌণ চরিত্রে মধ্যে যোগমায়া বিশেষ উল্লেখ্য। লাবণ্যর বাবা অবনীশের ভূমিকাও তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া আছে সিসি, লিসি, বিমি বোস, নরেন কুমার-মুখো প্রভৃতি দল যাদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে বিশশতকের বাংলাদেশের নাগরিক জীবনের বিশিষ্ট পরিশীলিত উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়। এরা পুরোপুরি ইঙ্গবঙ্গ অনুকরণজাত আধুনিক ধনী সম্প্রদায়। এদের প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন 'ফ্যাশনটা হল মুখোস'। শিলং এর শৈলাবাসেই বাঙালি পাঠক সম্ভভবত প্রথম দেখলেন বাংলাসাহিত্যের প্রথম গভর্নেসকে, দেখলেন অভিজাত বর্ষিয়সী যোগমায়ার আন্তরিক অথচ স্মার্ট উপস্থিতি, দেখলেন বিলেতে শিক্ষাপ্রাপ্ত কেটি মিত্তিরকে যে স্বচ্ছন্দে প্রথম আলাপেই ধূমপান করার জন্য এক বালিকার কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে বসে।

নাগরিক চেতনাঋদ্ধ আধুনিকতার অনন্য নিদর্শন শেষের কবিতা-তেই মেলে যেখানে নরনারীর প্রণয় ও পরিণয় সম্পর্কিত মুক্ত চিন্তার অভিনব প্রকাশদীপ্তি লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের অন্য সব উপন্যাস থেকে এ গ্রন্থ শিল্পরূপে স্বতন্ত্র। এই ছোট উপন্যাসে কুড়িটিরও বেশি কবিতা স্থান পেয়েছে। ফলে একে 'কাব্যোপন্যাস' বলা সঙ্গত। তবে কাব্যিক আবেদন সত্ত্বেও এটি মূলত উপন্যাস এবং পাত্রপাত্রীর মনোবিশ্লেষণও এতে যথাযথ চিত্রিত হয়েছে। সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করে বলা যায়—

> "প্রেমের স্বরূপধর্ম, তার বিস্ময়কর আত্মপ্রকাশ, মানবমনের সূক্ষ্ম ভাববৃত্তির ওপর তার বিচিত্রবর্ণের কলাপ বিস্তার, কবিত্বময় বিশ্লেষণের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে।"

৩.১১ দুইবোন (১৯৩৩)

রবীন্দ্র-উপন্যাসের শেষ পর্বের যুগলগ্রন্থর অন্যতম 'দুইবোন'। সমকালে রচিত 'মালঞ্চ'র সঙ্গে এর সম্পর্ক নিগূঢ়। বঙ্গাব্দ ১৩৩৯-এর অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত দুইবোন 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ পত্রিকাতেই বঙ্গাব্দ ১৩৪০-এর আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল 'মালঞ্চ'। কাহিনীগত দিক থেকেও এদের মধ্যে মিল আছে। উভয়ক্ষেত্রেই বিবাহিত পুরুষের জীবনে স্ত্রীর অসুস্থতার কালে সামাজিক সম্পর্কে আত্মীয়া রমণীর সঙ্গে প্রণয় সঞ্চারিত হয়েছে এবং ফলে ঘনিয়ে উঠেছে দাম্পত্য সংকট। দু'টি উপন্যাসের পরিণতি অবশ্য ভিন্নমুখী।

রবীন্দ্র উপন্যাসে তত্ত্বের প্রয়োগ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। আমাদের মনে হয়েছে 'যোগাযোগ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বভাবনা থেকে সম্পূর্ণ সরে এসেছিলেন। কিন্তু 'দুইবোনে' আবার সচেতনভাবেই তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু তাই নয় 'দুইবোন' উপন্যাসের শুরুই হয়েছে তত্ত্ব দিয়ে।

> "মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি, একজাত প্রধানত মা, আর একজাত প্রিয়া।"

—এই দুই নারীতত্ত্বের কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে উপন্যাসের কাহিনী। এর দুই বোন শর্মিলা আর ঊর্মিমালা যথাক্রমে মা ও প্রিয়ার জাতের মেয়ে। কবি রবীন্দ্রনাথ তাদের কাব্যিক উপমায় বেঁধেছেন—মা হল বর্ষা ঋতু আর প্রিয়া হল বসন্ত ঋতু।

পুরুষের জীবনে কোনো না কোনো সময়ে দুই নারীরই হয়ে ওঠে আকাঙ্ক্ষিতা, অভীপ্সিতা। এই চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বে জীবন হয়ে ওঠে জটিল, সংঘাত হয় জটিলতর।

'দুইবোন' উপন্যাসে শশাঙ্ক-শর্মিলার দাম্পত্য জীবনে ঊর্মির আবির্ভাবে যে তরঙ্গ হিল্লোল দেখা দিল, তাতে ঘনিয়ে এলো সংকটের কাল। এই সংকট উভয়পক্ষেই তীব্র হয়ে উঠলো, কারণ শশাঙ্কের জীবনের দুই নারী—আসলে দুই বোন। নামকরণের এই সচেতন ব্যঞ্জনই গড়ে তুলেছে নাট্য অভিঘাত। অসুস্থ শর্মিলার সঙ্গী হবার কারণে ঊর্মিমালার আবির্ভাব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিদির জীবনে মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে উঠলে সে-ই। আসলে শর্মিলার অতিরিক্ত সেবা যত্ন ও মমতায় শশাঙ্কর পৌরুষ মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করতে চাইত। তার রোম্যান্টিক মানসে কোথায় যেন একটু অতৃপ্ত কামনা ক্রিয়াশীল ছিল, সেবাপরায়ণা শর্মিলা যা পূর্ণ করতে পারেনি। একনিষ্ঠ দাম্পত্যর বাইরে যাবার মত জোর শশাঙ্কর ছিল না, কিন্তু শ্যালী-ভগ্নীপতির আপাতনিরীহ মধুর সরস সম্পর্কের সূত্রে হয়তো অজান্তেই তার হৃদয়ে প্রণয় প্রবেশ করলো। তখন তার আবেগ ও উচ্ছলতা এমনই বাঁধনহীন হল যে স্ত্রীর কথা ভাবার সময় রইলো না এমনকি তার ব্যবসাও ফেল পড়লো।

অনদিকে শর্মলা নিজের বোনের সঙ্গে স্বামীর হৃদয়গত সম্পর্ক অনুমান করতে পেরে বেদনার্ত হলেও নিজেকে সংযত করেছে। নিজের রোগের কারণে স্বামীর যথার্থ সহধর্মিনী হয়ে না ওঠার অজুহাতে নিজে থেকে বোনের সঙ্গে স্বামীর বিবাহের উদ্যোগ নিয়েছে। পাঠকের মনে বিষবৃক্ষের 'সূর্যমুখী'র কথা চকিতে ভেসে ওঠে। সেখানে নগেন্দ্র কুন্দকে বিবাহে সম্মতি দেয়। এখানেও শশাঙ্ক ঊর্মিকে বিবাহে মত দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে এই বিবাহ হয়ে ওঠেনি। শশাঙ্কর ব্যবসা ডুবে যাওয়ায় ঊর্মি যেন নিজের অপরাধবোধে পীড়িত হয়েছে, যে বোধ তার মনে প্রথমাবধি সুপ্ত ছিল—এই আঘাতে তা স্পষ্ট জাগ্রত হয়ে উঠে ঊর্মিকে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রায় প্রণোদিত করেছে। অন্যদিকে শর্মলা প্রায় অলৌকিকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে শশাঙ্ক নিজের অপরাধ উপলব্ধি করে ফিরে আসে শর্মিলার কাছে—

> "আবার ঋণ করেছি তোমার কাছে...যা ডুবিয়েছি আবার তাকে টেনে তুলবই, একদিন যেমন তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিল, তেমনি আবার আমাকে বিশ্বাস করো।"

শর্মিলাও তার বুদ্ধি ও বোধ এবং হৃদয় দিয়ে স্বামীর অনুতাপকে বুঝতে পেরেছে—তাই তাদের যথার্থ মিলনে উপন্যাস পেয়েছে সুখ পরিণতি। ঊর্মির চরিত্রের ট্র্যাজিক আভাস অনেকটাই প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে।

এই তিনটি প্রধান চরিত্রের সঙ্গে চতুর্থ চরিত্র—নীরদ, প্রথমাবধি যাকে ঊর্মির ভাবী স্বামী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই চারটি চরিত্রকে নিয়ে ঘটনাবর্ত সৃষ্টি করে উপন্যাসের চারটি অংশ চারজনের নামে চিহ্নত করা হয়েছে। তবে চতুরঙ্গের মত একটি প্রধান চরিত্র এখানে একা কথকের দায়িত্ব পালন করেনি।

আয়তনের দিক থেকে 'দুইবোন-কে ছোট উপন্যাস বলা যায়। অবশ্য এজাতীয় পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ শেষদিকে বারবার করেছেন। দুইবোন, মালঞ্চ ও চার অধ্যায়-এর আয়তন ছোটগল্প 'নষ্টনীড়ে'র মত। 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ' আয়তনে নষ্টনীড়ের চেয়ে কম। তবু রবীন্দ্রনাথ 'নষ্টনীড়'কে ছোটগল্প এবং দুইবোন-মালঞ্চকে উপন্যাস বলেই চিহ্নিত করেছেন। এর রচনারীতিতে আছে সংহত সংযম ও নাটকীয় চমৎকারিত্ব। ফলে একাধারে ছোটগল্পের সংযম, নাটকের শীর্ষসংঘাত এবং উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিলে এই উপন্যাসিকা হয়ে উঠেছে শিল্পিত এক সাহিত্য মাধ্যম।

৩.১২ মালঞ্চ (১৯৩৩)

দুইবোনের সমকালে লিখিত 'মালঞ্চ' উপন্যাসের বিষয়ও সমধর্মী। মনে হয় 'দুইবোনে' যা বলতে চেয়েছিলেন, তারই অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত রূপ—মালঞ্চ। 'মালঞ্চ'-তে দুইবোনের মতই এক পুরুষের দুই নারীতে আসক্তি ও আকর্ষণ, সেইসঙ্গে দ্বিতীয় এক পুরুষ চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কোনো দুটি উপন্যাসে এমন মিল আর দেখা যায় না। তবে আন্তর ধর্মে কিছু প্রভেদও আছে, সেটা স্পষ্ট হয়ে ধরদা পড়েছে নামকরণে। 'দুইবোন' যেখানে চরিত্রের ভাবদ্যোতক, মালঞ্চ সেখানে অনেকটাই প্রতীকধর্মী। 'মালঞ্চ' কেবল সাজানো বাগানই নয়—তা যেন আদিত্যর মানস-উদ্যানও। আদিত্য ফুল ফোটানোর কারিগর। তার প্রিয় বাগান তার ফুলের ব্যবসার উৎস। দোকানের দিক তার ব্যবসায়ী দিক, আর বাগান তার মনের রোম্যান্টিক দিক। ফুলের বাগান আদিত্য গড়ে তুলেছে স্ত্রী নীরজার সঙ্গে, তাদের দশ বছরের বিবাহিত জীবন ভরে উঠেছে মালঞ্চের পুষ্প লাবণ্যে। সন্তান সম্ভাবনার অঙ্কুর বিনিষ্ট হবার পর থেকেই কঠিন রোগে শয্যাগতা হল নীরজা। তার সেবা ও বাগানের পরিচর্যার কারণে সংসারে আগমন ঘটলো সরলার—আদিত্যর সঙ্গে তার আছে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তার ক্ষীণসূত্র। দুইবোনে শর্মিলার অসুস্থতার কারণে ঊর্মিমালার আগমনের কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে আসবে। তবে নীরজা যেমন শর্মিলা নয়—সরলাও ঊর্মির সমগোত্রীয় নয়। চরিত্রগুলি আন্তরধর্মে সদৃশ নয়, যদিও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে পরিস্থিতি অনেকটাই এক হয়ে উঠেছে।

সরলার জ্যাঠামশাই আদিত্যর সম্পর্কিত মেসোর কাছেই তার ফুলের শিক্ষা লাভ। নীরজার সঙ্গে বিয়ের আগে আদিত্যর সরলার সঙ্গে যে সখ্যতা ছিল, তার গভীরে অন্তর্লীন থাকা প্রেম আবার জেগে ওঠার সুযোগ পেল। অসুস্থ স্ত্রীর বাগানে অনুপস্থিতির সুযোগে আদিত্যর জীবনে জেগে উঠলো সুপ্ত প্রণয় মধুরিমা। 'মালঞ্চ' নতুন পুষ্পে হল মঞ্জরিত। সরলা 'দুইবোনে'র ঊর্মিমালা নয়—সেই উচ্ছলতার পরিবর্তে তার চরিত্রে আছে অন্তর্মুখী গভীরতা। সে নিজেকে আড়াল করে রাখতেই ভালোবাসে।

এ কাহিনীতেও দ্বিতীয় পুরুষ চরিত্র আছে—রমেন। দুইবোনের নীরদের সঙ্গে তার স্বভাবের কোনো মিল নেই। সরলা সম্পর্কে তার মনে আছে স্নিগ্ধ অনুরাগ। এই পারিবারিক উপন্যাসে রমেনের চরিত্রই রাজনীতির সূত্রে সামাজিক পরিমণ্ডলের স্পর্শ নিয়ে এসেছে। ১৯৩০ থেকে সারা দেশ জুড়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে আইন-অমান্য আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল এ কাহিনীতে সেই প্রসঙ্গ এসেছে তাতে রমেনের সক্রিয় যোগদানের সূত্রে। রমেন কারাবরণও করেছে, এমনকি সরলাও বে-আইনী সভাসমাবেশে যোগ দিয়ে জেলে গেছে। অবশ্য সরলার ক্ষেত্রে এটি এক ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তি—আদিত্য-নীরজার সংসার মালঞ্চ থেকে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা।

এ উপন্যাসের স্বল্প পরিসরে চারটি চরিত্রের অন্তর্লোক বিশ্লেষিত হয়েছে। আদিত্য-নীরজার দাম্পত্য সুখ নীরজার অসুস্থতায় সরলার উপস্থিতিতে অন্য দিকে বাঁক নিয়েছে। নীরজার ঈর্ষায় আদিত্য-সরলার সুপ্ত নুরাগ খুঁজে পেয়েছে প্রকাশের পথ। আবার রমেন তার প্রেম নিবেদন করেছে সরলাকে—যদিও আদিত্যকে ঘিরে সরলার হৃদয় দৌর্বল্য তার অজানা ছিল না। সরলার হৃদয় আদিত্যর কাছে বাঁধা পড়েছিল—কৈশোরকালের অঙ্কুর তরুণ যৌবনে মঞ্জরিত হবার পথ খুঁজে পেয়েছিল যদিও রমেনের প্রতিও ছিল তার এক ধরনের অনুরাগ। নীরজা চেয়েছে রমেনের সঙ্গে সরলার বিয়ে দিয়ে জটিল রহস্যের সহজ সমাধান। আদিত্য কর্তব্যপরায়ণ স্বামী কিন্তু সরলার মধ্যে তার প্রথম প্রণয়ের পূর্ণ বিকাশে তার প্রেমিক সত্তা নীরজার কাছ থেকে দূরে সরে এসেছে। চারটি চরিত্রের এই মানস আন্দোলনের ছবি উপন্যাসে দেখেছি—কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনেক সময়ই আড়ালে থেকে গেছে। অনেকটা ক্রমভঙ্গ রীতিতে লিখিত এই উপন্যাসে নাটকীয়তা অনেক বেশি। সম্ভবত এজন্যই রবীন্দ্রনাথ নিজে এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন।

দুইবোনের সমস্যা একই ধরনের হলেও সমাপ্তি কিন্তু ভিন্নতর। দুইবোনে ঊর্মি দিদির সংসার বাঁচাতে নিজে চলে যায় এবং শশাঙ্ক-শর্মিলার মিলন ঘটে। মালঞ্চ-তে কিন্তু শেষপর্যন্ত নীরজার মৃত্যু ঘটে। শেষ অধ্যায়ে নীরজা মনে মনে প্রস্তুত হয়েছে যে চিরবিদায়ের আগে সে প্রসন্নমনে সরলাকে দিয়ে যাবে আদিত্য ও মালঞ্চর সব দায়িত্ব। কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সরলা যখন তার কাছে এল তখন প্রবল উত্তেজনার মধ্যে নীরজা বুঝতে পারলো তা সে পারবেনা। তাই তার অন্তিম উক্তি—

> "দিতে পারবো না, পারবো না....। জায়গা হবে না তোর.... আমি থাকবো, থাকবো, থাকবো।"

এ কাহিনী তাই শেষপর্যন্ত বিষাদকরুণ হারাকারেই সমাপ্ত হয়েছে।

৩.১৩ চার অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাস—চার অধ্যায়। এটি পুরোপুরি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে। এই উপন্যাস প্রকাশকালে তর্কবির্তকের সৃষ্টি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনাও বিশেষ সমালোচিত হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এর মূল অবলম্বন কোনো আধুনিক বাঙালি নায়ক-নায়িকার প্রেমের ইতিহাস। সেই প্রেমের নাট্যরসাত্মক বিশেষত্ব ঘটিয়েছে বাংলা দেসের বিপ্লব প্রচেষ্টার ভূমিকায়। এখানে সেই বিপ্লবের বর্ণনা-অংশ গৌণ মাত্র, এই বিপ্লবের ঝোড়ো আবহাওয়ায় দুজনের প্রেমের মদ্যে যে তীব্রতা যে বদনা এনেছে সেইটেতেই সাহিত্যের পরিচয়।"

লেখকের এই উক্তি 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের প্রেমকাহিনীকেই আলোকিত করতে চেয়েছ। সমকালীন রাজনীতির ক্লেদাক্তরূপ ও বিপ্লবের ব্যর্থতাকে রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত করতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসের সূচনার 'আভাস' অংশটির কথা মনে আসে। এইঅংশে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গেগ কবির শেষ সাক্ষাৎকার বর্ণিত হয়েছে। আলাপ আলোচনার শেষে ব্রহ্মবান্ধব তাঁকে বলেন—'রবিবাবু আমার খুব পতন হয়েছে।'

এই ঘটনাটি 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের সূচনায় উল্লেখ করা হয়েছিল, যদিও পরে সেটিকে বাদ দিয়ে দেন। মনে হয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের এই সকরুণ স্বীকারোক্তি উপন্যাসের উৎস রূপে কাজ করেছে। সন্ত্রাসবাদী এই বিপ্লববাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব অস্ত্যর্থক ছিল না। দেশপ্রেমের নামে সন্ত্রাস, সুলভ ভাবাবেগ, আদর্শের নামে গুপ্তহত্যাকে তিনি কোনোদিন সমর্থন করেননি।

সেই বিরোধী বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে নায়ক অতীনের মুখে। বিপ্লবপন্থায় আস্থা না থাকলেও সে আছে ইন্দ্রনাথের বিপ্লবী দলে, যেখানে আছে নায়িকা এলা-ও। এলা ও অতীনের প্রেম এই ঝোড়ো আবহাওয়াতেও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো। কিন্তু দলের আদর্শ ওদের মিলতে দিল না। এইদলের মধ্যে আছে পুলিসের গোপন চর বটু—যে মনে মনে এলাকে কামনা করে, অতীনকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে চায়। এই পরিস্থিতিতে দলের সকলে এলার মৃত্যু কামনা করে এবং ইন্দ্রনাথ অতীনকেই দিয়েছিল এলাকে হত্যা করার দায়িত্ব। এলাকে বটুর হাত থেকে এবং পুলিশী নির্যাতন থেকে বাঁচাতে অতীন নিজেই নেয় তাকে হননের দুরূহ ভার। প্রেমের তীব্র গভীরতাতেই সে এলাকে চিরতরে ঘুম পাড়াবার দায়িত্ব নেয় এবং দুজনের আবেগতপ্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে উপন্যাস শেষ হয়।

রাজনীতি দিয়েই উপন্যাসটি সূচিত হয়, শেষও হয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে, কিন্তু তার মধ্যে নরনারীর প্রবল মিলনাকাঙ্ক্ষা বাঁধা পড়ে যায়। শেষ দৃশ্যের নাটকীয় মুহূর্তে অতীন এলার সংলাপ ও আচরণে যে আবেগ সংরাগের

রক্তিম উচ্চারণ ভালোবাসার অনন্ত তৃষ্ণার প্রকাশ—এমটি রবীন্দ্রনাথের অন্য রচনায় দেখা যায়নি। অগ্নিযুগের প্রলয়ঙ্কর পটভূমিতে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ কাহিনীর অতীন ও এলা প্রেমের জয় ঘোষণাই করে গেছে।

তাই দলপতি ইন্দ্রনাথ, দেশপ্রেমিক কানাই গুপ্ত, গুপ্তচর বটু মিলে যে সন্ত্রাসবাদের বিভীষিকাকে ঘনিয়ে তুলে থাকুক না কন, আসলে রবীন্দ্রনাথ প্রণয়পিপাসাতুর দুই নরনারীর প্রেমবাসনার ছবিকেই এখানে অনন্তের ফ্রেমে বন্দী করতে চেয়েছেন। সেইসঙ্গে সন্ত্রাসবাদের প্রলয়রূপকে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। ব্রহ্মবান্ধবের 'পতনে'র স্বীকারোক্তি তাঁকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কে বীতস্পৃহ করেছিল মনে হয়।

'চার অধ্যায়' নামকরণ সম্ভবত এর গঠনরীতি অনুসারে করা হয়েছে। এর প্রধান চরিত্র তিনটি কিন্তু চারটি বিচ্ছিন্ন অংশের সমন্বয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। এর কাহিনী রচিত হয়েছে নাটকীয় পদ্ধতিতে। গল্প বলার দিকে নজর না দিয়ে লেখক সংলাপমুখ্য নাট্যরীতিতে কাহিনীকে গতিশীল করেছেন।

৩.১৪ অনুশীলনী

১। বাংলাসাহিত্যের প্রথম সার্থক আধুনিক উপন্যাস হিসাবে 'চোখের বালির' মূল্যায়ন করুন।
২। মহাকাব্যির উপন্যাস হিসাবে 'গোরা'র পরিচয় দিন।
৩। 'ঘরে-বাইরে' নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।
৪। চতুরঙ্গ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কোনো তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন কী? প্রধানত শচীশ চরিত্র অবলম্বনে উত্তর দিন।
৫। যোগাযোগ উপন্যাসের দাম্পত্য সংকটের ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের সংঘাত কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করুন।
৬। কাব্যধর্মী উপন্যাস হিসাবে শেষের কবিতার মূল্যায়ন করুন।
৭। যুগল উপন্যাস দুইবোন ও মালঞ্চর তুলনামূলক আলোচনা করুন।
৮। রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে 'চার অধ্যায়'-এর সার্থকতা ও সীমাবদ্ধতার পরিচয় দিন।
৯। রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী চরিত্রের স্বরূপ ও বিবর্তনের পরিচয় দিন।
১০। রবীন্দ্র উপন্যাসের গৌণ চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৩.১৫ গ্রন্থপঞ্জি

১. রবীন্দ্রনাথ—সুবোধ কুমার সেনগুপ্ত।
২. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য—বুদ্ধদেব বসু।
৪. রবীন্দ্রমনন—রথীন্দ্রনাথ রায়, ১৯৮৭।
৫. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)—ক্ষেত্রগুপ্ত, ১৯৯৪।
৬. রবীন্দ্র উপন্যাস ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে—ভূদেব চৌধুরী।
৭. রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প—গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (দে'জ)
৮. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)—সুকুমার সেন।
৯. রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-নবমূল্যায়ণ (১৯৮৩-) অমরেশ দাশ।
১০. রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা—সহদেব দে (১৯৭১)।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.